# সংসার ভাবনা

ড্যানিয়েল হাকিকাতযু | উম্মে খালিদ
শায়খ ইউনুস কাথরাদা | গুল আফশান



সন্দীপন

"আর তাঁর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

[সূরা আর-রূম, ৩০:২১]

# সূচিপত্র

# শালীনতার শক্তি

-উম্মে খালিদ

হায়া বা শালীনতা অবশ্যই নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আবার এটা শুধু পোশাকেই সীমাবদ্ধ না; কথায়-কাজে সবকিছুতে শালীনতা প্রয়োজন। তবে নারীদের ক্ষেত্রে হায়ার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার।

আমরা যে যুগে বাস করছি, সেখানে শালীনতার ধারণাটাই যেন নিষিদ্ধ কোনো বস্তু। বিশেষ করে নারীর শালীনতা। গড়পড়তা মুসলিম কিংবা অমুসলিম, সবাই এই বিশ্বাস আত্মস্থ করে নিয়েছে।

পশ্চিমে এখন যেসব নারী শালীনভাবে চলাফেরা করেন, তাদের দেখা হয় নিপীড়িত হিসেবে। মনে করা হয় তাদের মূল্যবোধ সেকেলে, বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন। "এরা শরীর দেখাতে চায় না কেন? পরপুরুষদের সাথে যৌন-সম্পর্ক করে না কেন? নিশ্চয় কোনো সমস্যা আছে! মনে হয় ছোটকালে নিপীড়িত হয়েছিল। হুম!"

কিছু মুসলিম নারীও কিছুটা হলেও এই ফাঁদে পা দিয়েছেন। "দেখাই যদি না যায়, তাহলে কীভাবে কী?" এ নিয়ে তারা চিন্তিত। স্বাধীন হতে উদগ্রীব। ভদ্রভাবে চললে মানুষ ভীতু এবং লাজুক মুসলিম নারী ভেবে বসে কি না, এই ভয় থেকে ইচ্ছে করেই হাঁকডাক করে কথা বলেন।

A Return to Modesty: Discovering the Lost *Virtue* নামে একটি বই আছে। ওয়েন্ডি শালিতের লেখা এই বই।

উইলিয়ামস কলেজের শিক্ষার্থী থাকাকালে ওয়েন্ডি চরম বিপাকে পড়ে যান। জীবনে প্রথমবারের মতো দেখতে পান কোনো প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের জন্য একই বাথরুম। প্রকাশ করেন তার সহজাত অস্বস্তিবোধের কথা। সমাজে নারী-পুরুষ মেলামেশা স্বাভাবিকীকরণের বিপদ নিয়েও কথা বলেন তিনি। তিনি ২৩ বছর বয়সে এই বইটি

লিখেছিলেন।

লেখক প্রশ্ন রেখেছেন "যৌন শালীনতাকে মানুষ এত ভয় পায় কেন যে, এর কথা শুনলেই নির্যাতন বা বিভ্রান্তির অভিযোগ করে?"

শালিত ৫ টি আকর্ষণীয় পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন তার বইয়ে :

➡ বিভিন্ন ধরনের অশালীনতা

যৌন অশালীনতার বাইরেও আরও নানা ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা আছে। যেমন: পোশাকের অশালীনতা, প্রদর্শনের অশালীনতা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অতিছোট পোশাক, লাইভ-টুইটিং, ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলোর ভাইরাল ভিডিও এবং স্বীকারোক্তিমূলক ব্লগিং এর কথা। এ সবই নির্লজ্জতার উদাহরণ। যদিও এর সাথে যৌনমিলনের সম্পর্ক নেই। দার্শনিক আইন র‍্যান্ড এটিকে বলেছেন 'দেখিয়ে বেড়ানোর তাড়না'। ওয়েন্ডি শালিত এই কথাটিই ব্যাখ্যা করেছেন আরও বিশদভাবে।

এই অতিরিক্ত দেখিয়ে বেড়ানোর বিপরীতে গোপনীয়তা রক্ষার প্রশংসা করেন ওয়েন্ডি। যারা এটি অনুশীলন করেন, তাদেরও। তাও এমন একটি পৃথিবীতে, যেখানে নারীর কুমারীত্ব নিয়ে হাসাহাসি করা হয়। এই পৃথিবীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যৌনশিক্ষা চালু করা হয়। নারীরা আগের চেয়েও বেশি ইটিং ডিসঅর্ডার, স্টকিং, উদ্বেগ, যৌন হয়রানি এবং ডেট করতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। লেখিকা বলতে চাচ্ছেন যে, এগুলোর সমাধান হলো শালীনতা।

➡ নারীদের শালীন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এটি নারীর বৈশিষ্ট্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্য। শালিত লিখেছেন,

"শালীনতা একটি সহজাত আচরণ। এটি তৈরি হয় স্বাভাবিকভাবেই এবং নারীর ভালোর জন্য। যাতে তার প্রত্যাশা রক্ষা এবং পূরণ করা যায়। বিশেষ করে, জীবনে একজন পুরুষের ভালোবাসার জন্য যে প্রত্যাশা। এই প্রত্যাশার সাথে একধরনের দুর্বলতাও চলে আসে। কারণ, একজন পুরুষের কাছে আশাহত হওয়া মানে আমাদের আশাগুলো এক অর্থে শেষ হয়ে যাওয়া। এখান থেকেই কাজ শুরু শালীনতার। শালীনতা এই বিশেষ দুর্বলতাকে রূপান্তরিত করে শক্তিতে। ফলে নারী হুটহাট সিদ্ধান্ত না নিয়ে একটু বিলম্ব করে। দেখেশুনে বেছে নেয় এমন পুরুষদের, যারা আসলেই পাশে দাঁড়ানোর যোগ্য। লালসাও রূপান্তরিত হয় প্রেমে। ইচ্ছেমতো যৌনসঙ্গীর পেছনে ছুটে বেড়ানো

অসভ্য পুরুষদের গলায় লাগাম পরায় নারীর শালীনতা। তারা ঠেকায় পড়ে বুঝতে পারে যে, হাত বাড়ালেই নারীদের পাওয়া যায় না। তারা আসলে একজনমাত্র যোগ্য পুরুষের সন্ধানে থাকে।"

➡ নারীদের অশালীন হতে সাংস্কৃতিকভাবে চাপাচাপি করাটা আসলে তাদের প্রতি অন্যায়। অথচ তারা মনে করছে উলটোটা, এতে বুঝি তারা স্বাধীন হবে। এভাবে তাদের সহজাত প্রকৃতিকে কৃত্রিমভাবে দমন করতে বাধ্য করা হয়। তৈরি হয় মানসিক দ্বন্দ্ব, সেখান থেকে হতাশা। মুসলিম হিসেবে আমরা জানি যে, লজ্জাশীলতা মানুষের ফিতরাত। এতে হস্তক্ষেপ করা মানে ফিতরাত বিকৃতির চেষ্টা। শালিতের ভাষ্য,

"অশালীন হতে উৎসাহ পেয়ে নারী আসলে তার দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়। তারপর সে প্রকৃতপক্ষেই হয়ে ওঠে দুর্বল। মুখে মুখে যুক্তি দেয় যে, সে পুরুষের মতোই, তার কোনো বিশেষ দুর্বলতা নেই ইত্যাদি। কিন্তু এভাবে সে ঘুরেফিরে তার সহজাত নারীত্বই প্রদর্শন করছে। তবে শক্তি হিসেবে নয়, দুর্বলতা হিসেবে।"

অশ্লীলতা প্রসারের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল তাই নারীর আত্মসম্মান হ্রাস এবং তার মানবিকতা হরণ।

➡ পুরুষ কখনো কখনো নারীদের প্রতি অগ্রহণযোগ্য এবং অবমাননাকর আচরণ করে ঠিকই। কিন্তু সেটা অনেকাংশেই নিজের সিদ্ধান্তে নয়, সামাজিক অবস্থায় প্রভাবিত হয়ে। তারা দেখে যে, সমাজ চাইছেই সে এ রকম হোক। পুরুষরা শুধু প্রতিক্রিয়া জানায়। সুতরাং নারীরা শালীন হয়ে গেলে পুরুষরাও এ রকম হতে বাধ্য। পুরুষটা নষ্টামি করতে চাইছে বটে, কিন্তু করবে কার সাথে? সঙ্গী তো নেই। ফলে তারা বাধ্য হয় নারীদের সম্মান প্রদানে। উচ্ছৃঙ্খলতা ছেড়ে প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্বভিত্তিক সম্পর্ক গড়তে।

➡ নারীর ক্ষমতা আছে পুরুষের নীতি-আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করার। বইটির সমালোচকরা বইটিকে 'ভিক্টিম-ব্লেমিং' এর দায়ে অভিযুক্ত করে। তবে লেখকের যুক্তি এর চেয়ে আরও সূক্ষ্ম। তিনি বলছেন না যে, পুরুষদের অশ্লীলতার জন্য নারীরা দায়ী। অন্যায়ের পক্ষে সাফাই যেমন দেননি, তেমনি উপেক্ষাও করেননি সেই বাস্তবতাকে।

"যে সমাজ শালীনতাকে সমস্যা হিসেবে দেখছে, সেই সমাজ পুরুষের কাছ থেকে দায়িত্বশীলতা আদায় করে নিতে পারবে না। যে সমাজ শালীনতাকে সম্মান করে, সে সমাজে পুরুষরা দায়িত্বশীল হতে বাধ্য।"

বইয়ের অন্য একটি অংশে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বলেছেন। বলেছেন, “নারীরা যা করার অনুমতি দেন বা দেন না, তা পুরো সমাজের আচরণকে প্রভাবিত করে।”

শালিত বিশ্বাস করেন যে, শালীনতার মাধ্যমেই নারী-পুরুষের প্রকৃত সমতা সম্ভব।

বইটির এক পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে, “শালীনতা একটি অভ্যন্তরীণ সুরক্ষাব্যবস্থা, যা নারীদের অশ্রদ্ধাশীল পুরুষের নাগালের বাইরে রাখে। সনাতন ইয়াহূদী ধর্মীয় নিয়ম এবং ইসলামী পোশাক-নীতি শালিতের কাছে নারী-পুরুষ শালীনতার উপকারিতার বাস্তব উদাহরণ। এতে নারীদের দেহের নিয়ন্ত্রণ থাকে তাদের নিজেদের হাতেই। এভাবে নারীরা তাদের প্রেমাকাঙ্ক্ষার সৌন্দর্য রক্ষা করে, পুরুষদের বাধ্য করে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৎ হতে। পরিণতিতে বাড়িয়ে তোলে অন্তরঙ্গতার সম্ভাবনা।”

ওয়েন্ডি শালিত একজন ইয়াহূদী। তবে শালীনতার ব্যাপারে তার চিন্তাভাবনা ইসলামে শালীনতার ধারণার সাথে মেলে। আমাদের অনেক বোন নারীবাদীদের যৌন স্বাধীনতা, অসংযম, প্রদর্শনেচ্ছা ইত্যাদি ধ্যানধারণা দিয়ে প্রভাবিত। তাদের এই বইটি পড়া উচিত।

# বাঁচাও জীবনগুলো, বাঁচাও চেতনা

- উম্মে খালিদ

আগে আগে বিয়ে করার মতো অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে লিখেছিলাম কয়দিন পূর্বে। বলেছিলাম এটি সব রকম যিনা-ব্যভিচার, পাপ, সামাজিক বিকৃতি থেকে বাঁচার উপায়।

এই সোজাসাপ্টা কথার বিপরীতে কিছু মানুষের বক্তব্য দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমি।

এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু কথা বলার খুব প্রয়োজন।

মুসলিম বাবা-মা হিসেবে আমাদের উচিত তরুণ-তরুণীদের জন্য দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করা, যাতে বাবা-মায়ের অজান্তে তাদের গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ডেটে যেতে না হয়। কিংবা দেওয়া না লাগে মিথ্যা অজুহাত। যেন পর্ন-আসক্ত না হয় তারা।

হালালের বাড়তি মানেই হারামের ঘাটতি। সোজা হিসাব!

অথচ এই সোজা জিনিসের ব্যাপারে কিছু লোকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলি।

"না, তাদের উচিত হস্তমৈথুন করা।"

কী অদ্ভুত! একজন মুসলিম ভাই সরাসরি এই কথা বলছে।

আরেক বোন বলল, "পুরুষদের উচিত দৃষ্টি সংযত রাখা। আর কিছু আলিম তো সাময়িক সমাধান হিসেবে হস্তমৈথুন করার অনুমতি দিয়েছেনই। এটি অভ্যাসে পরিণত না হলেই হলো। সহজ বিষয়।"

সত্যি? এতই সহজ? আমরা এসব কী বলছি!

যা-ই হোক, আরও ভয়ানক কিছু মানুষের কিছু ভয়ানক কথা শুনে নিই।

"তালাক ব্যভিচারের চেয়েও খারাপ।"

"বিয়ে যিনাকে প্রতিরোধ করতে পারে না।"

"বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু যৌনকামনা পূরণ করা নয়।"

"যা সহজে আসে, তা সহজে চলেও যায়। খুব সহজেই যা পাওয়া যায়, তার কদর করা হয় না।"

"তাহলে বাচ্চা-কাচ্চা?"

"কৈশোরের শেষ পর্যায়ে থাকা তরুণরা মানসিকভাবে পরিপক্ব নয়। যোগাযোগ দক্ষতাও ভালো না তাদের।"

"তাদের আগে নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত।"

"এই সমাধানটি খুব সরলীকৃত ও কাল্পনিক।"

"বিয়ে শৈশব কেড়ে নেয়।"

"সংসার কীভাবে চলবে?"

"পুরোনো ইসলামী সংস্কৃতিচর্চা আমাদের আধুনিক সময়ের জন্য অবাস্তব। তা ছাড়া অতীতের ভাবালুতা আজকের তরুণদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।"

"নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা প্রয়োজন।"

"এতে সমাজের কথাকে তোয়াক্কা না করার মানসিকতা তৈরি হয়।"

"বিশ-বাইশ বছর বয়সে তো মানুষ নিজেকেই ঠিকমতো চেনে না। পরে অনেক পরিবর্তনও আসতে পারে।"

"এর পরিবর্তে আমাদের উচিত সন্তানদের নিজেরা সামাল দেওয়া। সংযত হতে শেখানো। যেমন, নিজেকে সংযত না করতে পারলেই ধর্ষণের মতো অপরাধ ঘটে। বৈবাহিক ধর্ষণও এর অন্তর্ভুক্ত।"

"যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা আসলে বেশ সহজ।"

"বিয়ে কোনো সমাধানই না। বিকৃত যৌনতার লোকেরা বিবাহিত অবস্থায়ও

যৌনবিকৃতিই প্রকাশ করবে।"

"বর্তমান সমাজকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণের (রা.) সমাজের সাথে মেলালে হবে না।"

"কোনো এক ছেলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না বলে আমার মেয়ের কৈশোর নষ্ট করব নাকি!"

দ্বিমত পোষণ করার এই হলো বেশির ভাগ কারণ।

কিছু কথা জেনে নিন।

## ১. বিয়ে, যৌনতা এবং ব্যভিচার:

যিনা-ব্যভিচার এড়ানোর সবচেয়ে শক্তিশালী উপায় হলো বিয়ে। জি, এটাই সত্য। আমি বুঝি না কিছু মানুষ কীভাবে এই সহজ সত্যটিকে অস্বীকার করতে চায়।

বিবাহিত হয়েও প্রতারণা করে, এমন মানুষ আছে। এ রকমটা হয়। কিন্তু এতে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটির অকার্যকারিতা প্রমাণিত হয় না। ইসলাম বিয়েকে উৎসাহ দেয়, কারণ তা যিনা থেকে বিরত রাখে। এটি খুবই পুণ্যের কাজ এবং গুরুতর পাপ থেকে সুরক্ষাকারী।

## ২. হস্তমৈথুন প্রসঙ্গে:

হস্তমৈথুন কীভাবে সমাধান হতে পারে, আমি এখনো বিস্মিত।

আমার মনে হয় ভুলটা হচ্ছে এখানে। ব্যভিচারের চেয়ে যেহেতু হস্তমৈথুন ভালো, সেহেতু এখান থেকে উপসংহার টানা হয় তাড়াতাড়ি বিয়ে করার চেয়েও তা ভালো। এটা মিথ্যা। ইসলামকে চিন্তার মাপকাঠি বানিয়ে ভাবুন। হস্তমৈথুন এবং ব্যভিচার দুটোই পাপ। পাপের মাত্রা রয়েছে। যিনার শাস্তি 'হদ'। হস্তমৈথুনের এ রকম কোনো শাস্তি না থাকলেও এটি পাপ। তাড়াতাড়ি বিয়ে করা পাপ নয়।

## ৩. বিয়ে এবং বাচ্চা:

১৭-২২ বছরের মধ্যে বিয়ে করে ফেলতে বলি আমি। এর মানে এই নয় যে, দ্রুত সন্তানও নিয়ে নিতে হবে। বিয়ের পর সন্তান গ্রহণের জন্য সময় নেওয়াই যায়। বিয়ে মানেই হুট করে বাবা-মা হয়ে যাওয়া নয়।

## ৪. পরিপক্কতা এবং বিয়ের প্রস্তুতি:

দ্রুত বিয়ের পরামর্শ এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। সন্তানকে বিয়েও দেব, সেই সাথে ধৈর্য ও তাকওয়ার মতো গুণাবলিও শেখাব। উপযুক্ত বৈবাহিক প্রশিক্ষণ, রাগ নিয়ন্ত্রণ, বোঝাপড়া, আবেগীয় এবং মানসিক দক্ষতা—বাদ যাবে না কিছুই। প্রত্যেকটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা একটার কথা শুনলে আরেকটাকে বাদ মনে করেন কেন, বুঝলাম না!

কম বয়সে বিয়ের পরামর্শ দেওয়ার মানে এই না যে, বিয়েকে রসিকতা বা হালকা বিষয় বলে ভাবছি। এই বয়সেই গুরুত্ব এবং দায়িত্ব-প্রস্তুতি সহকারে বিয়ে করা যেতে পারে।

## ৫. ব্যভিচারের ভয়াবহতা:

ব্যভিচার একটি কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচার করতেই শুধু নিষেধ করেননি। এর কাছেও যেতে নিষেধ করেছেন স্পষ্ট ও কঠোরভাবে।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

**"ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। এটি লজ্জাজনক কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা।"**[১]

বিভিন্ন ধরনের যিনার কথা হাদীস থেকে জানা যায়। চোখের যিনা, হাতের যিনা, পায়ের যিনা।

বাস্তবতা হলো, যিনার সাথে আরও অনেক পাপের সম্পর্ক আছে। এমনি এমনি হয়ে যায় না এটি। ব্যভিচারের সূত্রপাত ঘটায় এমন কিছু পাপ আছে।

خلوة (খালওয়া বা নির্জনে একত্র হওয়া), تبارز (তবারুজ বা নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন), إختلاط (ইখতিলাত বা অবাধ মেলামেশা), ফ্লার্টিং, সেক্সটিং, পর্ন, হস্তমৈথুন ইত্যাদির মাধ্যমে সূত্রপাত ঘটে যিনার।

মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ে মারাত্মকভাবে। কিছু তরুণের পর্ন-আসক্তি থাকে, আবার কেউ হস্তমৈথুনে আসক্ত, কেউ-বা আসক্ত হারাম সম্পর্কে। কেন এসব হারামে জড়িয়ে যায় তারা? কারণ, তারা জানে যে, হালাল কিছুর অনুমতি পেতে তাদের বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে।

[১] সূরা আল-ইসরা, ৩২

তাদের দ্রুত হালাল পন্থার ব্যবস্থা করে দিন। এই বোধটুকুই বদলে দেবে তাদের। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে আলো দেখে তারা পরিহার করবে অন্ধকার।

বিয়ে কঠিন করে ফেলা মানে তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া। তারা হতাশায় নিমজ্জিত হয়। শয়তান হয় উল্লসিত। তারা অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়। হস্তমৈথুন করে, পর্ন দেখে।

## ৬. যৌনকামনা: মেয়ে বনাম ছেলে

জগৎকে শুধু পুরুষের দৃষ্টি দিয়ে দেখা ছাড়ুন। নারীদেরও একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে, আছে আকাঙ্ক্ষা-বঞ্চনা।

সংকীর্ণ দৃষ্টির লোকেরা ভাবে যে, বিয়েতে শুধু পুরুষদেরই লাভ। তাদের ধারণা কিশোরী-তরুণীদের কোনো যৌনকামনা নেই। কেবল ছেলেদেরই আছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

অনেক মেয়ের বয়ঃসন্ধির শুরু থেকেই প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা থাকে। এই মেয়েদের সহায়তা করবে দ্রুত বিয়ে। শারীরিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তারা রক্ষা পাবে পাপ থেকে। বিয়ে কোনো লোলুপ পুরুষের চাহিদা মেটানো আর নারী-নির্যাতনের সরঞ্জাম নয়।

প্রমাণ ছাড়া লোকে কেবল মুখের কথা বিশ্বাস করে না। ব্যক্তিগতভাবে এমন অনেক মেয়েকে চিনি আমি। তাদের সাথে আমি কথা বলেছি, কাজ করেছি। তারা হয় ব্যভিচারের কাছে গিয়েছে, নয়তো এতে সরাসরি লিপ্ত হয়েছে।

পনেরো বছর বয়সি এক মুসলিম মেয়ে হাইস্কুলের ড্রামা ক্লাবে যোগ দিয়েছিল। কেন জানেন? যাতে এক অমুসলিম ছেলে সহপাঠীর সাথে দেখা করতে পারে। সময় কাটাতে পারে বাবা-মায়ের অজান্তে।

আমার পরিচিত এক মুসলিম মেয়ে ইচ্ছা করে বাসা থেকে দূরে এক কলেজে ভর্তি হয়। উদ্দেশ্য—অবাধে পার্টিতে যাওয়া ও যিনা করা। নারী এবং পুরুষ উভয়ের সাথেই যিনা করেছিল সে। মেয়েটা এতটাই উশৃঙ্খল হয়ে পড়ে যে, তার অমুসলিম বন্ধুরাও চিন্তিত হয়ে যায় তাকে নিয়ে।

এক অল্পবয়সি মুসলিম মেয়ে অমুসলিম আমেরিকান এক ছেলের সাথে গোপনে অনলাইনে টেক্সট করা শুরু করে। তার বয়স তখন ১৪ আর ছেলের ১৯। এখন তার

বয়স ২১ এবং ছেলের বয়স ২৬। এখনো প্রতিদিন কথা হয় তাদের। সে তার অন্যান্য বিবাহিত ভাইবোনদের সাথে দেখা করার কথা বলে বের হয়। অথচ চলে যায় সেই ছেলের সাথে দেখা করতে অন্য স্টেটে। বাবা-মা কিছুই জানে না। সে ওই ছেলের সাথে বাইরে খাওয়া-দাওয়া করে, গাঁজা খায় আর চিল করে। যিনা যে খুব জঘন্য পাপ, এই বোধটুকু থাকায় যৌনসম্পর্ক স্থাপন করেনি। কিন্তু ওই সময়টুকু হিজাব খুলে রাখে সে। উগ্র পোশাক পরে।

এগুলো বাস্তবতা। আপনারাই বরং মানবসমাজকে চোখ খুলে দেখেন না। অতি-সরলীকৃত আর ভাবালু সমাধানের স্বপ্নে ডুবে আছেন আপনারাই।

দয়া করে চোখ-কান খুলুন। দেখার চেষ্টা করুন মুসলিম তরুণ-তরুণীদের জীবনের বাস্তবতা। লাগামহীন, উগ্র যৌনতা-বেষ্টিত এই সেক্যুলার সমাজে তারা কীভাবে বেঁচে-বর্তে আছে, দেখে আসুন।

কাল্পনিক সমাধানে ভেসে চলবেন না। হালকাভাবে নেবেন না যিনা ও হস্তমৈথুনের মতো ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো।

মুসলিম তরুণদের দয়া করুন!

বাঁচাও জীবনগুলো, বাঁচাও চেতনা!

# বিয়ে করতে চান যদি

-শাইখ ইউনূস কাথরাদা

বিয়ে নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। বিয়ে ও উত্তম জীবনসঙ্গী খুঁজে পাওয়ার উপায় সম্পর্কে জানতে চান তারা। কিছু বাস্তবসম্মত ও পরীক্ষিত পরামর্শ দিচ্ছি।

মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। বিয়ে একটি ইবাদাত। তাই আমরা প্রত্যেকটি বিষয়ের মতো এ ক্ষেত্রেও আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

❖ আপনার নিয়ত খাঁটি এবং সৎ কি না, নিশ্চিত করুন। বিয়ে কেন করবেন? কারণ, এটি সুন্নাহ। নিজেকে পবিত্র রাখার এবং হালাল সঙ্গী ও সুকূন লাভের মাধ্যম। আল্লাহ আল কুরআনে এভাবেই বলেছেন।

❖ জেনে রাখুন, সমস্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকর্তা আল্লাহ। একমাত্র আল্লাহর হুকুমেই সব সম্ভব। আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকুন। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহর কাছে কাতর আবেদন জানান, তিনি যেন আপনার জন্য বিয়েকে সহজ করে দেন। দুআ কবুলের প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানান। সিজদায়, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে। ভিখারির মতো চাইতে থাকুন আল্লাহর কাছে। সেই সাথে রাখুন আল্লাহর প্রতি দৃঢ় তাওয়াক্কুল। সুধারণা রাখুন যে, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করবেন। খামখেয়ালি ও দায়সারা দুআ করবেন না। মনে রাখবেন, আমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলছি। কোনো তুচ্ছ মানুষের সাথে না। দুআয় তাড়াহুড়োও করবেন না, দুআ করা বন্ধও করবেন না। আপনার জন্য সঠিক সময় কোনটি, এটা অবশ্যই আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহকে সময় বেঁধে দিতে যাবেন না। মনে রাখবেন, আপনি আল্লাহর কর্মপরিকল্পনার অধীন। উলটোটা নয়। আপনার তাড়া আছে বলেই আল্লাহ তাঁর নির্ধারিত সময়ের ব্যতিক্রম করবেন না।

❖ আল্লাহর আদেশ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন। ফরয তো ঠিক রাখবেনই। পাশাপাশি করবেন বেশি করে নফল ইবাদাত। যেমন : যিকর, নফল নামাজ, নফল রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, সাদাকাহ, অন্যকে সাহায্য করা ইত্যাদি।

আপনি আল্লাহর যত নিকটবর্তী হবেন, তত পাপ থেকে দূরে থাকবেন। ততই বেড়ে যাবে দুআ কবুলের সম্ভাবনা।

❖ বিয়ের জন্য সন্দেহজনক উপায় অবলম্বন করবেন না। অনেক ম্যাট্রিমনিয়াল ওয়েবসাইটের কাজকর্ম প্রশ্নবিদ্ধ। শরীয়তের বিধিবিধান অনুসরণ করুন। অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়া দেখা করবেন না পাত্র-পাত্রীর সাথে। আল্লাহর অবাধ্যতা করে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির তোয়াক্কাই করে না অনেক রিলেশনশিপ এক্সপার্ট ও ম্যারেজ প্রফেশনাল। এদের পরামর্শ এড়িয়ে চলুন। যত বেশি আল্লাহর আনুগত্য করব, ইতিবাচক ফলাফল আশা করতে পারব তত বেশি।

❖ হতাশ হবেন না। নিয়ত সহীহ রাখুন। প্রত্যেকটা হালাল পন্থা ব্যবহার করে এগিয়ে চলুন। এখনই বিয়ে না করলে জীবন থেমে যাবে না। চেষ্টা করার সাথে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রাখুন। আল্লাহর ইচ্ছামতো সব যথাসময়ে হবে।

❖ একেবারে মরিয়া হবেন না। অবশ্যই সব দিক ভালো করে বিবেচনা না করে বিয়ে করতে যাবেন না। প্রত্যাশা ও পরিকল্পনাকে রাখুন বাস্তবসম্মত।

❖ পছন্দের পাত্র/পাত্রীকে প্রশ্ন করুন। এ ক্ষেত্রে লজ্জা পাবেন না। আপনার প্রত্যাশা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিন তাকে। কোনো সমস্যা দেখা দিলে কীভাবে সমাধান করা হবে, কে কেমন আর্থিক অবস্থা আশা করেন, সন্তান লালন ও ঘর-গৃহস্থালির কাজ সম্পর্কে কার কী মত, সব আলাপ করুন খোলাখুলিভাবে। বর্তমান সময়ে এমনি এমনি কোনো কিছু বুঝে নেওয়া সম্ভব না। স্বচ্ছতা অবলম্বন করতে হবে। সম্ভাব্য জীবনসঙ্গীর সাথে কথা বলার সময় সততা অবলম্বন করুন। কোনো কিছু অতিরঞ্জিতও করবেন না, লুকোছাপাও করবেন না।

❖ বিয়ে সহজ করার একটি উপায় হলো পরিবারকে সম্পৃক্ত করা এবং বন্ধুবান্ধব ও সমাজে এই ব্যাপারে জানানো। নেটওয়ার্কিং একটি কার্যকরী উপায়। সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে এটা।

❖ কাউকে উপযুক্ত মনে হলে তার সম্পর্কে আশপাশে খোঁজখবর নিন। চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। পরামর্শ করুন বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের সাথে। এমন লোকদের পরামর্শ নিন, যারা আসলেই পরামর্শ দানের যোগ্য।

প্রস্তাব মনে ধরলে ইস্তিখারা করুন। বারবার করার প্রয়োজন নেই। স্বপ্ন বা অলৌকিক

কোনো নিদর্শনও দেখতে হবে না। ইস্তিখারা করুন এবং এগিয়ে যান। কল্যাণকর হলে আল্লাহ তাআলা এটা সহজ করে দেবেন।

❖ পরামর্শ ও ইস্তিখারা করার পরে আল্লাহর যা ইচ্ছা ও হুকুম, সেটা মেনে নিন। সবকিছু মনমতো না হলে হতাশ হবেন না। ফলাফল যা-ই হোক, শুধু মনে রাখবেন এটাই হওয়ার কথা ছিল। এটাই আপনার জন্য সর্বোত্তম। আপনি আল্লাহর দিকে ফিরেছেন, তাঁর কাছে হৃদয়ের ফরিয়াদ জানিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে সর্বোত্তম বিষয়টি ভিক্ষা চেয়েছেন। সুতরাং, তিনি আপনার জন্য যা চেয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকুন। ভিন্ন ধারণা পোষণ করবেন না।

যারা বিয়ে করতে চাইছে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বিয়ে সহজ করে দিন। দূর করে দিন তাদের মধ্যকার সব অকল্যাণ। কল্যাণকর করুন তাদের দাম্পত্য-জীবনকে।

# বিপ্রতীপ

-উম্মে খালিদ

প্রথমবার আমার স্বামী আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমি প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলাম। আমার বয়স তখন ১৮ বছর। কলেজের নবীন শিক্ষার্থী ছিলাম সে সময়। আর নিজেকে ভাবতাম ফেমিনিস্ট।

পরে তিনি আমাকে আবারও প্রস্তাব দেন।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বিয়ে হয়। তখন আমার বয়স ২১। আমার জীবনে আল্লাহর দেয়া অন্যতম সুন্দরতম নিয়ামত হলো বিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ।

কিন্তু প্রথমবার প্রস্তাব পাওয়ার সময় আমার মাথায় কী চলছিল জানেন?

হাইস্কুলে থাকতে কিছুদিন পার্টটাইম জব করেছিলাম একটি ক্যাফেতে। সেখানে একজন বোন আমার সাথে কাজ করতেন।

ধরে নিই, তার নাম হানান। হানান একজন ৩২ বছর বয়সি মরোক্কান বোন। তিনি সেই ক্যাফেতে ফুল টাইম কাজ করতেন। তার ডান হাতের একটি আঙুল ছিল বাঁকা। একদিন তিনি আমাকে এর পেছনের কারণ জানান। তিনি একজন ল্যাটিনো নও-মুসলিমকে বিয়ে করেছিলেন। ভেবেছিলেন সে কত-না জানি চমৎকার মানুষ! তাই তাকে বিয়ে করতে রাজি হন। কিন্তু বিয়ের পর দেখলেন লোকটা তার প্রত্যাশার একেবারে বিপরীত। সে লোকটাই তার আঙুল ভেঙেছে। ডিভোর্স হয়ে গেল তাদের। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য হানান এরপর এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, আঙুলের চিকিৎসা করানোর সময়ও তার হলো না। সেরে গেলেও এখনো বাঁকা হয়ে আছে আঙুলটি। উফ, ভয়ানক!

প্রথমবার কলেজ সহপাঠীর বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর এই হানানের কথাই আমার মনে পড়েছিল।

আপনার কী মনে হয়? এটি কি কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক চিন্তা?

আমার মনে হয় না।

হাইস্কুল জীবনের শেষ ও কলেজ জীবনের শুরুর দিকে গভীরভাবে ভ্রান্ত ফেমিনিস্ট চিন্তাধারা লালন করতাম আমি। ভাবতাম যে, বিয়ে একটি ফাঁদ। নারী নির্যাতনের একটি উপায়। মনে হতো পুরুষমাত্রই দানব। নারী-নির্যাতনই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আর জীবনকে শিকলবন্দী করার সবচেয়ে ভালো উপায় সন্তান জন্ম দেয়া। ভাবতাম স্ত্রী এবং মা হওয়া মূলত দাসত্ব গ্রহণ করার নামান্তর।

এটা অসুস্থ চিন্তা-ভাবনা।

ফেমিনিজম এভাবে আমার মস্তিষ্ক আক্রান্ত করে ফেলে। আমাকে বোঝায় যে পুরুষরা সহজাতভাবেই খারাপ, অবিশ্বস্ত ও অপরাধী। এভাবেই নারীবাদ নারীদের পুরুষদের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। ট্র্যাডিশনাল জেন্ডার রোল নষ্ট করে দেয়। পরিবারকে করে তোলে অস্থিতিশীল।

আলহামদুলিল্লাহ, আমি বহুদিন আগেই নারীবাদী বিভ্রম থেকে বেরিয়ে এসে একটি স্বাভাবিক, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করছি। বুঝতে পেরেছি যে "পুরুষরা আমাদের শত্রু" এই মনস্তত্ত্বটি প্রকৃতপক্ষে কতটা বিকৃত।

তবে বর্তমানে, সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায় এই বিকৃতিতে ডুবে যাচ্ছে। আইডিয়াল মুসলিমাহ নামক পেইজের একটি সাম্প্রতিক জনপ্রিয় লেখা সম্পর্কে একজন আমাকে আমার মতামত জানাতে বলেন।

এতে বলা হয়, মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সতর্ক থাকা উচিত। কারণ, পুরুষরা অত্যাচারী। তা ছাড়া প্রতারক, নীচ, দুশ্চরিত্র, কর্তৃত্ববাদী পুরুষদের থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়। এই লেখাটির সামগ্রিক লক্ষ্য ছিল মুসলিমাহদের দেরিতে বিয়ে করতে উৎসাহ দেয়া। আর পুরুষদের নির্যাতনের শিকার হলে বিচ্ছেদ এবং একাকী জীবন বেছে নেয়া। এই পোস্টটাতে দুই হাজারেরও বেশি লাইক পড়েছে। অর্থাৎ দুই হাজার মুসলিম বোন এটি পড়েছেন এবং এর সাথে একমত হয়েছেন।

ফেমিনিজম এই কাজটাই করে। পোস্টটির লেখক স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এটি ফেমিনিস্ট বা লিবারেল মতাদর্শ-প্রভাবিত লেখা নয়। কিন্তু আমি এই চিন্তাকাঠামোটা চিনি। নিজে ফেমিনিস্ট থাকা অবস্থায় আমি ঠিক এই চিন্তাটাই লালন করতাম।

এই মানসিকতার প্রভাবে খুব সূক্ষ্ম কিন্তু মারাত্মকভাবে পুরুষকে দোষারোপ এবং নারীকে নির্যাতিতা হিসেবে উপস্থাপন করা।

**পুরুষ = অত্যাচারী গুন্ডা**

**নারী = অসহায় ভুক্তভোগী**

তরুণ মুসলিমাহদের মনে তৈরি হওয়া এ এক মারাত্মক দ্বন্দ্ব। এটি নির্ঘাত মিথ্যাও বটে।

অবশ্যই কিছু পুরুষ অমানুষ, যাদের চরিত্র খারাপ এবং ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা নেই। তবে কিছু অনুরূপ অমানুষ নারীও আছে। এমন পুরুষ আছে, যারা নারীর কাছ থেকে স্রেফ নিজের সুবিধা আদায় করে। এমন নারীও আছে, পুরুষদের থেকে ফায়দা লোটে।

এরপর আমার বয়স বেড়েছে, বেড়েছে জীবনের অভিজ্ঞতাও। নারীর দ্বারা পুরুষের নির্যাতিত হওয়ার অনেক ভয়ানক ঘটনার সাক্ষী আমি। দেখেছি নারীর দ্বারা পুরুষকে ব্যবহৃত হতে, এমনকি আঘাত পেতে।

তামির (ছদ্মনাম) নামে এক ভাইয়ের গল্প বলি। তার স্ত্রী ও দুটি মেয়ে ছিল। তার স্ত্রী বরাবরই ছিল স্বার্থপর এবং লোভী মহিলা। কিন্তু মেয়েদের কথা ভেবে তামির তাকে সহ্য করছিলেন। এই মারমুখী, অত্যাচারী স্ত্রীর সাথে খুবই কষ্টের দাম্পত্য-জীবন কাটাচ্ছিলেন তিনি। হয়তো স্ত্রীকে সহ্য করতে হবে, কিন্তু বিনিময়ে অন্তত কন্যাদের উজাড় করে ভালোবাসার সুযোগটুকু মিলবে।

ওই মহিলা একসময় ইবাদাত-বন্দেগি বন্ধ করে দিল। হিজাব বাদ দিয়ে দিল। নাকে প্লাস্টিক সার্জারি করল। তারপর ইসলামই ত্যাগ করে ফেলল প্রকাশ্যে।

একসময় পরকীয়া করতে শুরু করে তার স্ত্রী। ব্যভিচার করতে থাকে। তামির সব জানতে পারার পরও এসব নির্লজ্জতা বাদ দেয়নি সে। তার মধ্যে কোনো অনুশোচনাও ছিল না। উল্টো তামিরকেই অপমান করে।

তারপর এই মহিলা বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করে। আদালতে মিথ্যা বলে। দাবি করে যে, তামির তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেছেন। আর কথিত "ধর্মীয় নির্যাতন" তো আছেই। সে তামিরকে আরব-মুসলিম জঙ্গী বলে অভিযুক্ত করে।

আদালতে চলল তার কুমিরের কান্না এবং দুঃখের নাটক। দুর্দান্ত অভিনেত্রী ছিল এই মহিলা।

তামির সেখানে দাঁড়িয়ে তার অভিনয় দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তাকিয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। তার আরব পরিবার তাকে জনসম্মুখে কাঁদতে শেখায়নি।

বিচারক বিশ্বাস করে বসলেন সবকিছু। কারণ অসহায়, নিপীড়িত মুসলিম মহিলার ছাঁচের জন্য সে ছিল সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আর তামির উপযুক্ত ছিলেন অত্যাচারী মুসলিম পুরুষ হিসেবে।

ডিভোর্সের পরে এই মহিলা তাকে অর্থের জন্য রীতিমতো লুট করে ফেলে। তামির ছিলেন ছোটখাটো একটি ব্যবসার মালিক। এই মহিলা তাকে সেটা বন্ধ করতে বাধ্য করে। তার সমস্ত সঞ্চয় আত্মসাৎ করেই ক্ষান্ত হয় না। সেই সাথে নিজের উঁচু দরের ডিভোর্স ল'ইয়ারের পারিশ্রমিক দিতেও বাধ্য করে তামিরকে।

আর বাচ্চাদের ব্যাপারে সে যা করে, তার তুলনায় এসব কিছুই না। সে মেয়ে দুটোর সম্পূর্ণ কাস্টডি পেয়ে গেল। অথচ এরা ছিল তামিরের গোটা পৃথিবী। কয়েক বছর সে তামিরকে মেয়েদের সাথে দেখাই করতে দেয়নি।  স্নেহময় বাবা তখনো বড় মেয়েটির স্মৃতিতে জ্বলজ্বলে।

সে প্রায়ই বাবার জন্য কাঁদত। জিজ্ঞেস করত কেন সে তার বাবাকে আর দেখতে পারবে না। তার মা নির্লজ্জভাবে মিথ্যা বলে যে, বাবা তাকে ভালোবাসে না, তাকে দেখতেও চায় না। নির্বিকারভাবে ছোট মেয়েটিকে কাঁদতে দেখত সে। মাসের পর মাস প্রতিরাতে কেঁদে কেঁদে ঘুমাত মেয়েটা।

ওদিকে তামিরও প্রতিরাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েন। একসময় কাটতে শুরু করে নির্ঘুম রাত।

প্রাক্তন স্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে তার জীবনের একমাত্র আশা কেড়ে নিয়েছে। সে জানে মেয়েগুলো ছিল তামিরের জীবন। তাকে আরও যন্ত্রণা দেয়ার জন্য তার প্রাক্তন স্ত্রী জানাল যে, সে তার মেয়েদের ব্যাপ্টাইজড করেছে। তাদের প্রতি রবিবার চার্চে নিয়ে যায় সে তার নতুন খ্রিষ্টান স্বামী টমির সাথে।

প্রতিটি হানানের বিপরীতে রয়েছে কোনো-না-কোনো তামির। কিন্তু তামিররা প্রকাশ্যে কাঁদে না। তাদের গল্পগুলো সহজে শোনায় না। হানানরা শোনায়। তাই আমরা কেবল সেগুলোই দেখি। ধরে নিই যে, তামির বলে কিছু নেই।

সত্য কথাটা হলো, বিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষা রাখা উচিত। জীবনসাথি বাছাই করার

আগে যথাযথ পরিশ্রম করুন এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন।

হ্যাঁ, বিয়ে একদমই প্রত্যাশার বিপরীত হতে পারে। হয়তো দেখা যাবে স্বামী বা স্ত্রী খারাপ একজন মানুষ। তবে সবকিছুর মধ্যেই তো ঝুঁকি আছে। অপহৃত হওয়ার ভয়ে কি ঘর থেকে বের হব না? দুর্ঘটনার ভয়ে কি যানবাহনে চড়া বন্ধ করে দেব?

আল্লাহ আমাদের কাজকর্ম সংশোধন করে দিন এবং প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে উত্তম জীবনসঙ্গী, ছিমছাম পরিবার এবং দৃঢ় বন্ধনপূর্ণ সংসার দান করুন, আমীন।

# সৎপাত্রে কন্যাদান

-ড্যানিয়েল হাকিকাতযু

আমি ২৩ বছর বয়সে বিয়ে করি। কিন্তু বিয়ের চেষ্টা করছিলাম সেই ১৯ বছর বয়স থেকেই। চার চারটি বছর লেগে যায় তাতে!

২৩ বছর বয়সেও আমার না ছিল কোনো চাকরি, আর না কোনো ক্যারিয়ার। তখনো আমি ছাত্র। ছিল না নিজস্ব কোনো বাড়ি। থাকতাম একটি বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্টে। সেটাকে একটা ছোট্ট কুঠুরি বললেও ভুল হবে না। নিজস্ব গাড়ির কথা তো বাদই দিলাম। গণপরিবহন ছিল ভরসা। ছিল না কোনো সঞ্চয়। কাঙ্ক্ষিত পাত্র বলতে যা বোঝায়, তার কোনো যোগ্যতাই তখন আমার নেই।

তাহলে শ্বশুরবাড়ির লোকদের রাজি করলাম কীভাবে?

এত সহজেও সব হয়ে যায়নি। তবে তারা দেখলেন যে, আমার অন্তত মৌলিক ইসলামী জ্ঞান আছে। আছে ইসলামের চর্চাও। চেষ্টা করছিলাম আরও ইলম অর্জন করার। তাদের কাছে আমার খুলুক (চরিত্র) গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। দুনিয়াবি ক্যারিয়ার যে একদমই বিবেচনায় নেননি, তা না। তবে তারা দেখলেন যে, আমি কঠোর পরিশ্রমী। জীবন নিয়ে আমার পরিকল্পনা আছে। আছে আশা-আকাঙ্ক্ষা। ব্যস, এতেই তারা আপাতত সন্তুষ্ট।

আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন। অন্য কেউ হলে এমন পরিস্থিতিতে মেয়ে বিয়ে দিতে একদমই রাজি হতেন না।

মুসলিম বাবা-মায়েদের উদ্দেশে বলছি,

সম্ভাব্য পাত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত মানদণ্ড নির্ধারণ করুন। মেয়েকে তার চেয়ে ১০ থেকে ১৫ বছরের বড় কারও সাথে বিয়ে দিতে চাইলে আলাদা কথা। কিন্তু যদি

প্রায় সমবয়সি পাত্র চান, তাহলে পাত্রের বৈষয়িক সম্পদকে প্রধান বিবেচ্য বানাবেন না; বরং প্রাধান্য দিন তার দ্বীন ও খুলুককে। এই দুটোকে আমাদের রাসূল ﷺ ও গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

হাদীসে আছে,

**"পাত্রের দ্বীন ও চরিত্র যদি সন্তোষজনক মনে হয়, তাহলে তার কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দাও। অন্যথায় পৃথিবীতে ফিতনা এবং ব্যাপক পাপাচার ছড়িয়ে পড়বে।"[২]**

**"একজন পুরুষের মর্যাদা তার দ্বীনে, পুরুষত্ব বুদ্ধিমত্তায় এবং সম্মান চরিত্রে।"**

মুসলিম নারীদের উদ্দেশে বলছি,

পাত্র পছন্দের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত মানদণ্ড নির্ধারণ করুন। স্মার্ট হোন। মনে রাখবেন, জেনারেলের স্ত্রী হতে চাইলে বিয়ে করতে হবে একজন লেফটেন্যান্টকে। সে-ই পরে পদোন্নতি পেয়ে জেনারেল হবে।

বিয়ে নিয়ে ভাবার জন্য আপনার বয়স ৩০ এর আশেপাশে হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তোড়জোড় শুরু করে দিন। যদি মনে করেন যে, বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তাহলেই কিন্তু দেরি হয়ে যাবে।

মুসলিম ব্যাচেলরদের উদ্দেশে বলছি,

সব দিক দিয়ে আত্মোন্নতির চেষ্টা করুন। শুরু করুন নিজের দ্বীনদারি ও চরিত্র দিয়েই। অনেক জায়গা থেকেই আপনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে পারে। এটা স্বাভাবিক। এতে হতাশ হবেন না; বরং এটাই যেন প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য আপনাকে আরও মজবুত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে।

যে ভাই ও বোনেরা বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন, তাদের উদ্দেশে বলছি,

---

[২] তিরমিজি : ১০৮৪

কখনো আশা হারাবেন না। আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে দুআ করতে থাকুন,

হে আল্লাহ, যা কিছু সর্বোত্তম আপনি আমাকে তা দান করুন!

হে আল্লাহ, আপনি জানেন এবং আমি জানি না!

হে আল্লাহ, আমার জন্য যা সর্বোত্তম তা পাওয়া আমার জন্য সহজ করে দিন!

আল্লাহর সাহায্য তো অবশ্যই চান, তাই না? তাহলে নিজেকে আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য বানিয়ে নিন।

# স্বামী বাছাই

-উম্মে খালিদ

স্ত্রী হওয়ার ব্যাপারটা আসলে কেমন, তা নিয়ে ইদানীং কিছু চিন্তা-ভাবনা করছি। ভাবছি "ভালো স্ত্রী" হওয়া বলতে আসলে কী বোঝায়। এ নিয়ে তেমন একটা আলোচনা শুনি না আজকাল। ফেমিনিস্ট কালচারের কল্যাণে 'ভালো স্ত্রী' কথাটাই বর্তমানে একটি নোংরা কথায় পরিণত হয়েছে।

অথচ ইসলামে বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর স্বামীকে করা হয়েছে প্রভূত মর্যাদার অধিকারী।

> আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যদি কোনো নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমজান মাসে সাওম পালন করে, তার সতীত্ব রক্ষা করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে দরজা পছন্দ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।"[৩]

সুতরাং বোধসম্পন্ন একজন মুসলিমাহ স্বভাবতই ভালো স্ত্রী হওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান।

ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে ধারাবাহিক আলোচনা করা হবে।

<u>১ম ধাপ :</u> একজন উত্তম স্বামী বাছাই করুন।

<u>২য় ধাপ :</u> তার সাথে সদ্ব্যবহার করুন।

বোনেরা, আপনার স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহার করুন।

পুরুষ মানুষ আসলে খুব সহজ-সরল একটা প্রাণী। অন্তত আমাদের নারীদের চেয়ে তাদের আবেগ-অনুভূতি বহুগুণে সরল।

---

[৩] সহীহ আল-জামী, ৬৬০

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীকে খুশি করা অদ্ভুত-রকমের সহজ। উত্তম আচরণ দিয়ে স্রেফ খুশি করে দিন তাকে। দেখবেন তার হৃদয়ের মালিক হয়ে গেছেন। স্বামী মহাশয় তখন আপনাকে সুখী রাখার জন্য যত কিছু করা সম্ভব, সব করতে উঠেপড়ে লেগে যাবে।

প্রাচীন একটি আরবী প্রবাদে বলা হয়েছে,

**"মর্যাদাবানকে সম্মান দিন, তার মালিক হয়ে যাবেন।**
**আর নীচকে সম্মান দিন, বিনিময়ে বেঈমানি পাবেন।"[৪]**

তাই স্বামী বাছাই করার প্রথম ধাপটিতেই হতে হবে প্রচণ্ড সাবধানী।

স্বামী যদি নীতিবান, উঁচু মানসিকতার ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তাহলে উত্তম আচরণের বিনিময়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে আপনার হয়ে যাবেন। ঠিক সেই আরবি প্রবাদের মতো। আপনার উত্তম আচরণ, উদারতা ও যত্নের প্রতিদান দিতে হন্যে হয়ে উঠবেন তিনি।

হয়তো ভালোবাসায় তিনি আপনাকেই ছাড়িয়ে যাবেন। কারণ, পুরুষ মানুষকে তৈরিই করা হয়েছে ওভাবে। স্ত্রী ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করা, তাদের সুখী ও নিরাপদ রাখা, তাদের চাহিদা মেটানোকে পুরুষরা তাদের কর্তব্য মনে করেন। পারলে পুরুষরা তাদের প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কিছু করতে চান। সুতরাং আপনি ভালো থাকলেই আপনার স্বামী সন্তুষ্ট।

ঠিক বিপরীতটা ঘটবে স্বামী ভালো মানুষ না হলে। উদারতার প্রতিদান তো পাবেনই না। উলটো সে ফায়দা লুটবে এখান থেকে। সোজা কথায় ছোটলোক। এ রকম লোক সদ্ব্যবহার পেলে বরং এর অপব্যবহার করে। ধরেই নেয় এটা তার প্রাপ্য।

পৃথিবীতে ভালো ও খারাপ উভয় রকমের নারী আছে। আছে ভালো ও খারাপ পুরুষ। 'ভালো' কথাটিতে আসলে নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গের একচেটিয়া আধিপত্য নেই। যদিও নারীবাদীরা আমাদের বলার চেষ্টা করে যে, সব নারী ভালো এবং প্রায় সব পুরুষই খারাপ। তাদের এসব মিথ্যাচার উপেক্ষা করুন।

তাই বোনেরা, স্বামী বাছাই করার ব্যাপারে সাবধানী হোন। সম্ভব হলে এ ক্ষেত্রে আপনার অভিভাবকের সাহায্য এবং বিচক্ষণতার ওপর নির্ভর করুন। ভালো, ন্যায়নিষ্ঠ, ধার্মিক

---

[৪] আবু মানসুর ছাআলাবী; আত-তামছীল ওয়াল মুহাদ্বারাহ : ১১১।

মুসলিম স্বামী চেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করুন। বিয়েতে পাত্র বাছাইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন। তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে বলেছেন,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ

**"এবং যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।"[৫]**

যদি আল্লাহ আপনাকে এ রকম স্বামী দিয়েই দেন, তাহলে তার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করুন। আদর-সোহাগ যেমন দেবেন, তেমনি দেবেন শ্রদ্ধা-সমীহ। আর এর ফলাফল দেখে আপনি খুশি না হয়ে পারবেন না ইনশাআল্লাহ!

---

[৫] সূরা আত-তালাক : ৩

# নারীত্ব! সেটা আবার কী?

-উম্মে খালিদ

“নারীত্ব”-এর আরবি শব্দ الأنوثة, যা أنثى (নারী) শব্দ থেকে উদ্ভূত। আল-কুরআনে বহুবার এসেছে শব্দটি।

নারী ও পুরুষ একে অন্যের চেয়ে ভিন্ন। কুরআনে সুস্পষ্টভাবে এই বিষয়টি বলা আছে।

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ

**“আর পুরুষ তো নারীর মতো নয় ...।”[৬]**

পুরুষরা পুরুষালি, নারীরা নারীসুলভ। সোজা কথা!

নারী ও পুরুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য।

আল্লাহ বলেছেন,

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۝

**“কসম রাতের, যখন তা ঢেকে দেয়। কসম দিনের, যখন তা আলোকিত হয়। কসম তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় তোমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকারের।”[৭]**

নারীত্বের ব্যাপারটি পুরুষত্বের একেবারে বিপরীত। দুটির মধ্যে অনেক কিছুতেই হয়তো মিল আছে। তবে পুরুষ ও নারীর বৈশিষ্ট্য রাত ও দিনের মতোই আলাদা।

---

[৬] সূরা আলে ইমরান : ৩৬

[৭] সূরা আল-লাইল : ১-৪

কিছু মুসলিম মানতেই চান না এটা। জোর দিয়ে বলেন "না, না! প্রতিটি নারীই আলাদা। সুতরাং 'নারীত্ব' নামক সাধারণ কোনো ধারণা থাকতেই পারে না।" তারা ইসলামের কিছু লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নির্দেশনার প্রসঙ্গ টেনে আনেন নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে। যেমন : পুরুষ এবং নারী উভয়কেই সত্যবাদী, ধার্মিক, সাহসী ও সত্যের প্রতি নিবেদিত হতে হবে। এগুলো দিয়ে প্রমাণ করতে চান যে, ইসলামে 'নারীত্ব' বলে আলাদা কিছু নেই। ওসব নাকি পশ্চিমা নারীবাদীদের আবিষ্কার।

এটা ভুল ধারণা। পুরুষ ও নারীর মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে বটে। কিন্তু এটিও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাদের অনেক বৈশিষ্ট্যই ভিন্ন।
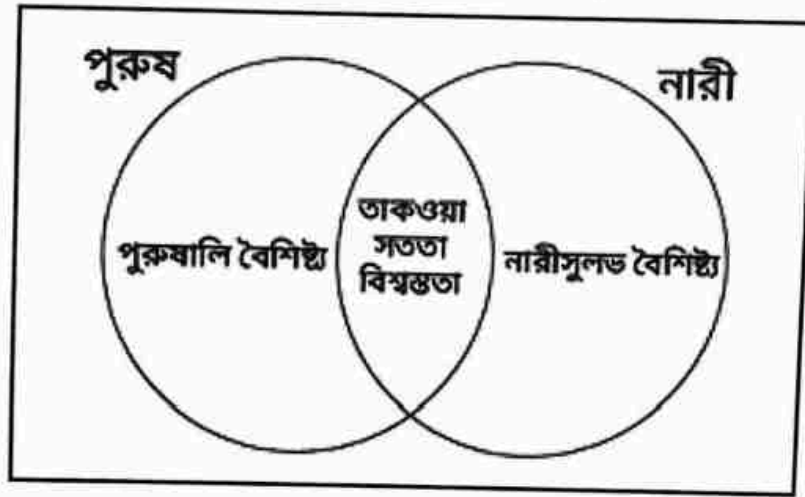
বিষয়টি অনেকটা ভেন-চিত্রের মতো। দুটি বৃত্তের যতটুকু অংশ সাধারণ, সেখানে রয়েছে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ইসলামী নির্দেশনা। আর বাকি অংশ লিঙ্গভিত্তিক। একটি পুরুষসুলভ এবং অন্যটি স্ত্রীসুলভ।

অনেকের ধারণা 'নারীত্ব' বলতে দুর্বলতা বা নির্বুদ্ধিতা বোঝানো হয়। সম্ভবত এ কারণেই ইসলামে নারীত্বের ধারণা অস্বীকার করেন তারা। অথচ এটা ভুল ধারণা। তা ছাড়া নারীত্ব কেবল "সাজুগুজু"র সমার্থক শব্দও নয়; বরং নারীসুলভ শক্তি এবং বুদ্ধিও নারীত্বের অন্তর্ভুক্ত। শক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন ধরনের। কিছু আছে সহজাতভাবেই পুরুষালি, কোনোটা মেয়েলি।

শারীরিক আকার এবং শক্তিতে পুরুষ এগিয়ে। অন্যদিকে নারী মানসিক শক্তি এবং সহনশীলতায় পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়। পুরুষরা বাম-মস্তিষ্ক নির্ভর, যেখানে যুক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা থাকে। অন্যদিকে নারীরা ডান-মস্তিষ্ক নির্ভর। সেখানে থাকে আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি প্রবণতা এবং জটিল সামাজিক বিষয়গুলো বোঝার

পারদর্শিতা।

কোনোটিই খারাপ নয়। তারা কেবল ভিন্ন। পুরষ এবং নারীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বৈপরীত্য আছে।

এই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যই প্রতিটি লিঙ্গের ভূমিকা পূর্বনির্ধারিত করে দেয়।

এই দুই লিঙ্গের ভূমিকা কী ও আল্লাহ তাঁর কিতাবে এ সম্পর্কে কী বলেছেন?

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

**"পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক। কারণ, আল্লাহ তাদের একের ওপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষেরা নিজের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হিফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হিফাযত করে।"[৮]**

ভিন্ন ভিন্ন লৈঙ্গিক ভূমিকা ও গুণাবলির ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য এখান থেকে শুরু। ভেন-চিত্রের আলাদা অংশগুলোর মতো। এগুলো প্রতিটি লিঙ্গের জন্য সুনির্দিষ্ট। একদিকে পুরুষসুলভ এবং অন্যদিকে নারীসুলভ।

পুরুষের ভূমিকার মধ্যে আছে কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, সুরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্ত্রীর জন্য আর্থিক ব্যবস্থা।

নারীর ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো আনুগত্য, নমনীয়তা এবং স্বামীকে সহায়তা করা।

একজন পুরুষ তার স্ত্রী ও পরিবার পরিচালনা করার জন্য দায়বদ্ধ। তাকে এই কাজটা করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি সহকারে। আর স্ত্রীর দায়িত্ব তার স্বামীর অনুসরণ ও হালাল যাবতীয় বিষয়ে তাকে মান্য করা।

কুরআনুল কারীমের অন্যান্য আয়াতে স্ত্রীর ভূমিকা বর্ণনা করা হয়েছে একজন মা হিসেবে, যিনি সন্তান জন্মদান এবং তার লালনপালনে সক্ষম। স্বামীর ভূমিকা থাকে আর্থিক ক্ষেত্রে। (আল-বাকারাহ, ২২৮ ও ২৩৩)।

---

[৮] সূরা আন-নিসা : ৩৪

কুরআনে যে সকল ধার্মিক, মুমিন নারীদের কাহিনি রয়েছে, তারা সকলে বিনয়ী, মর্যাদাশালী, ধৈর্যশীল, আল্লাহকে ভয় করা মুসলিমাহ। যেমন : মূসা ﷺ-এর মা, ফিরআউনের স্ত্রী, শুয়াইব ﷺ-এর কন্যা ও মুসার স্ত্রী, ঈসা ﷺ-এর মা মরিয়ম, মরিয়মের মা-সহ আরও অনেকে।

নারীত্বের মানে স্রেফ কিছু বাহ্যিক বা হাস্যকর বৈশিষ্ট্য না; বরং অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উভয় দিকই নারীত্বের অন্তর্ভুক্ত।

বিনয়, লজ্জাশীলতা, যত্নশীলতা, সাহায্য-পরায়ণতা, আনুগত্য ইত্যাদি হলো অভ্যন্তরীণ গুণ। এগুলো মূলত স্ত্রী এবং মায়ের ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

তাহলে বাহ্যিক দিক কোনগুলো? কুরআন অনুযায়ী নারীত্বের বাহ্যিক বিষয়গুলোর কেন্দ্রবিন্দু হলো পর্দা। অর্থাৎ, গায়রে মাহরাম পুরুষদের থেকে নারীর নারীত্বকে গোপন রাখা। আল্লাহ নারীদের সৃষ্টিই করেছেন সব-রকম নমনীয়তা-কোমলতা দিয়ে।

এই আয়াতটি দেখুন,

يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي

**"...যে অলংকারে লালিত-পালিত হয়..."[১]**

এখানে নারীদের কথা বলা হচ্ছে। ইবনে কাসীর, আত-তাবারীসহ অন্যান্য তাফসির থেকে এমনটিই জানা যায়। সাহাবী ইবনে আব্বাস ﷺ-সহ অন্যদের ব্যাখ্যা এটিই।

নারীরা রেশমি কাপড় এবং সোনার গহনা পরেন। পুরুষরা করেন না এমনটি। অলংকার-গহনার মতো সৌন্দর্যবর্ধক জিনিসগুলোর উদ্দেশ্যই হলো নারীত্বের সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলোকে আরও উদ্ভাসিত করে তোলা।

আরবিতে একে বলা হয় الْحِلْيَةِ। "অলংকরণ"। কুরআনে এর আরেকটি সমার্থক শব্দ আছে (আল-আরাফ, ৩১ ইত্যাদি) الزينة যার অর্থ সাজসজ্জা বা সৌন্দর্যবর্ধন।

আত-তাবারী বলেছেন,

**"জিনাহ (সাজসজ্জা) অর্থ যা নারীরা তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে ব্যবহার করে।**

---

[১] সূরা আয-যুখরুফ : ১৮

**যেমন : পোশাক, গহনা, কাজল, রং ইত্যাদি।"[১০]**

নারীদের সহজাতভাবেই শারীরিক সাজসজ্জা এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির দিকে ঝোঁক থাকে। এটি কোনো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য নয়।

কথা হলো, এই সৌন্দর্য কে দেখতে পারবে এবং কে পারবে না?

আল্লাহ এই প্রশ্নের উত্তর সূরা নূরে এভাবে দিয়েছেন,

**"এবং তারা তাদের স্বামী ব্যতীত তাদের জিনাহ (সৌন্দর্য) কারও কাছে প্রকাশ করবে না।"**

সূরা আন নূরের ৩০তম আয়াতে আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষদের দুটি কাজ করার আদেশ দেন : দৃষ্টিকে অবনত করে রাখো এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করো।

পরের আয়াতে আল্লাহ মুমিন নারীদের একই নির্দেশ দিয়েছেন। তবে সাথে আছে তৃতীয় আরেকটি। তাদের জিনাহকে প্রকাশ না করা। যা এমনিতেই প্রকাশমান, ততটুকু করা যাবে কেবল। বাকিটুকু দেখতে পাবে শুধু স্বামী ও মাহরাম আত্মীয়রা। এটিই পর্দার বিধান।

আরেকটি নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য হলো পুরুষদের মনোযোগ আকর্ষণ করার ইচ্ছা। সূরা নূরে একই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

**"এবং তারা যেন গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।"[১১]**

তাফসীর থেকে জানা যায় যে, মহিলারা সে যুগেও الخلخال বা নূপুর পরতেন। পুরুষদের পাশ দিয়ে যাবার সময় কিছু নারী ইচ্ছা করে পা মাটিতে এমনভাবে আঘাত করতেন, যাতে নূপুরের শব্দ শুনে পুরুষরা ফিরে তাকায়।

এই ঝোঁক শুধু সে যুগের বিষয় নয়; বরং চিরন্তন। আজকালও আমরা স্লোগান শুনি "দেখিয়ে দাও অদেখা তোমায়" কিংবা "নাথিং টু হাইড"। নারীরা আসলেই পুরুষদের

---

[১০] তাফসীরুত তাবারী : ১৯/১৫৫

[১১] সূরা আন নূর : ৩১

নজর কাড়তে ও প্রশংসা পেতে পছন্দ করে।

ইসলাম যা করে তা হলো, নারীর এই সহজাত আকাঙ্ক্ষাকে একটা সুন্দর সীমা বেঁধে দেওয়া। এই সীমার নাম বিয়ে। নারী তার স্বামীর জন্য নির্দ্বিধায় নিজেকে সজ্জিত করতে পারে। তবে অন্য কোনো পুরুষ (গায়রে মাহরাম) এর জন্য তা করা নিষেধ। নিষিদ্ধ পরিসরে সাজসজ্জা প্রকাশকে বলা হয় تبرج তাবাররুজ।

এই হলো মোটাদাগে নারীত্বের ভেতর-বাহির। এর সূক্ষ্মতর দিকগুলো সামনে আরও আলোচিত হবে।

# নারীত্বের প্রয়োগ

-উম্মে খালিদ

শুরু করছি আমার পছন্দের একটি হাদীস দিয়ে। নারীবাদীরা আবার প্রচণ্ড ঘৃণা করে এই হাদীস।

> **আবু সাঈদ আল খুদরী ﵁ বর্ণনা করেছেন, একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো এক ঈদের সালাতে যাচ্ছিলেন। কিছু নারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদের বললেন, "মহিলাগণ, বেশি করে দান-সদকা করো। দেখলাম যে, জাহান্নামের বেশির ভাগ অধিবাসীই তোমরা।"**
>
> **তারা জিজ্ঞেস করলেন, "নবিজি, এটার কারণ কী?"**
>
> **তিনি বললেন, "তোমরা অতিরিক্ত অভিশাপ দাও এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তোমাদের বুদ্ধিও কম, দ্বীনদারিও কম। অথচ বুদ্ধিমান পুরুষকে নির্বোধ বানাতে আর কাউকে তোমাদের চেয়ে পটু দেখিনি।"[১২]**

মুসলিম ফেমিনিস্টরা অবশ্য এই সুন্দর হাদীসটির কথা শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। মনে করে হাদীসটা বুঝি "বিতর্কিত"। অথচ এটা সহীহ বুখারীর হাদীস। তারা আসলে হাদীসটির মূল বার্তাই বোঝেনি। এই হাদীসে নাকি নারীদের ছোট করা হয়েছে।

ভুল!

বরং পুরুষত্বের ওপর নারীত্বের ক্ষমতার ইঙ্গিত দেখতে পাই আমরা এই হাদীসে। দেখতে পাই পুরুষের ওপর নারীর অবাধ ক্ষমতার স্বীকৃতি। নারীরা সাধারণত জনসম্মুখে এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম সক্রিয় থাকেন। শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও পুরুষের চেয়ে ছোট এবং দুর্বল।

---

[১২] সহিহ বুখারি : ৩০৪

একজন পুরুষ তার শক্তি-বুদ্ধি সত্ত্বেও কখনো নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিতে পারে কোনো নারীর কাছে। যৌন আকর্ষণ এক অপ্রতিরোধ্য জিনিস। নারীর প্রতি পুরুষের যেমন রয়েছে আকাঙ্ক্ষা, তেমনি আছে প্রয়োজন। সেটা এত প্রবল হতে পারে যে, এটি তার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিও লোপ করে দিতে পারে। এমনকি ধীরস্থির স্বভাবের একটা পুরুষও বোকার মতো কাজ করে বসতে পারে কোনো নারীর জন্য। করতে পারে এমন কাজ, যা তার চরিত্রের সাথে একেবারেই যায় না।

এটা নারীদের এক অনন্য ও বিস্ময়কর ক্ষমতা!

মুগিস এবং বারীরার ঘটনায় ঠিক এ বিষয়টিই আমরা দেখতে পাই।

বিয়ের সময় বারীরা এবং মুগিস দুজনই ছিলেন দাস। বারীরা একসময় দাসত্ব থেকে মুক্ত হলেন, কিন্তু মুগিস রয়ে গেলেন আগের অবস্থাতেই। স্বাধীন নারীকে দাস বিয়ে করতে পারে না। তাই স্বাধীন হওয়ার পরে বারীরা চাইলে এই বৈবাহিক সম্পর্ক রাখতেও পারতেন, ছিন্নও করতে পারতেন। তিনি ছিন্ন করতে চাইলেন।

কিন্তু মুগিস তাকে এত ভালবাসতেন যে, একদমই মেনে নিতে পারেননি ব্যাপারটা। তিনি একেবারে জনসম্মুখে কেঁদে কেঁদে তার পিছু হাঁটতেন। অনুনয়-বিনয় করে বলতেন, “বারীরা, একবার তাকাও আমার দিকে। একটিবার কথা বলো।”

এমনকি সাহাবিদের গিয়ে বলতেন, “ওকে একটু আমার কথা বলেন না!” আবু বকর রা., উমর রা. এবং শেষমেশ রাসূল ﷺ-কেও বললেন সুপারিশ করতে।

তখন নবী করীম ﷺ বারীরাকে বললেন, “ওর কাছে ফিরে গেলে হয় না?”

বারীরা বললেন, “আল্লাহর রাসূল, এটা কি আপনার আদেশ?”

তিনি বললেন, “আদেশ না। তার জন্য সুপারিশ করছি আরকি।”

বারীরা বললেন, “আমার তাকে প্রয়োজন নেই।”

রাসুল ﷺ আব্বাসকে বলেছিলেন, “বিষয়টা অদ্ভুত না, আব্বাস? মুগিস বারীরাকে কী ভালোবাসে! আর বারীরা মুগিসকে কতই-না ঘৃণা করে!”

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, “দৃশ্যটা যেন আজও আমার চোখে ভাসে। মুগিস বারীরার পেছনে ঘুরঘুর করতে করতে কাঁদছে। চোখের পানিতে দাড়ি ভিজে যাচ্ছে

তার।”[১৩]

পুরুষদের ওপর নারীর এই ক্ষমতার আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় ‘লায়লা-মজনুর’ গল্পে। আরবের সুপ্রাচীন উপকথা এটি।

মজনু কিন্তু তার আসল নাম নয়। তার নাম ছিল কায়স। সে লায়লার প্রেমে একেবারে দিওয়ানা হয়ে গেল। লায়লাকে বিয়ে করতে না পেরে পাগল হয়ে যায় সে। পরিচিতি লাভ করে “মাজনুন” বা “পাগল” নামে। এই পাগলামির কারণেই আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে সে।

তৃতীয় আরেকটি বিস্ময়কর ঘটনা। একজন যুবক একটি মেয়েকে পাওয়ার জন্য তার নিজ শহরের বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে সহযোগিতা করে।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ﵁ ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি। তারা রোমান-অধিকৃত প্রধান শহর দামেস্কে একটি দীর্ঘ অবরোধ আরোপ করে রেখেছিলেন। শহরটিকে কঠোর নিরাপত্তা দিয়ে ধরে রেখেছিল রোমানরা। কয়েক মাস চেষ্টার পরও মুসলমানরা রোমান-প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে পারেনি।

একরাতে এক রোমান যুবক দামেস্কের ফটক পেরিয়ে আসে। খালিদের সাথে একটি গোপন বৈঠক করার অনুরোধ করে সে। যুবক খালিদকে প্রস্তাব দিল যে, সে মুসলমানদের শহরটি জয় করতে সাহায্য করবে। তবে একটি শর্তে। শর্তটি হলো মুসলমানরা শহর দখল করে নেওয়ার পরে খালিদ যেন যুবকের প্রেমিকাকে তার সাথে বিয়ে করিয়ে দেয়। তাকে পাত্র হিসেবে নাকচ করে দিয়েছিলেন মেয়ের বাবা।

খালিদ তাকে দেন পালটা আরেকটি শর্ত। এই রোমান যুবককে খ্রিষ্টধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হতে হবে। যুবকটি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যায়।

পরিকল্পনাটি ভালোই ফলপ্রসূ হলো। ধর্মান্তরিত রোমান যুবক খালিদকে অবরোধ ভাঙতে সহায়তা করে। জয়লাভ করে মুসলমানরা। কিন্তু সেই মেয়েটি রোমানদের পরাজয়ের পরদিনই অন্য অনেকের মতো শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

হতাশ হয়ে যুবকটি আবারও গেলো খালিদের কাছে। খালিদ তখন বিশাল অঞ্চল দখল-পরবর্তী নানা কাজে ব্যস্ত। সেই যুবক তাকে পালিয়ে যাওয়া রোমানদের পিছু ধাওয়া করার অনুরোধ জানায়।

---

[১৩] সহিহ বুখারি, ৫২৮৩, ৫২৮৪। আসকালানী; ফাতহুল বারি, ৯/৪০৮-৯

খালিদ অবাক হয়ে তাকালেন তার দিকে। বললেন, "আমি তাদের আক্রমণ করতে পারব না, যুবক। তাদের সাথে নিরাপত্তা-চুক্তি হয়েছে আমাদের।"

চুক্তিটি ছিল, যেসব রোমান দামেস্ক ছেড়ে চলে যেতে চায়, তাদের ওপর কোনো রকম আক্রমণ করা হবে না। তিন দিনের মধ্যে নিরাপদে শহর ছেড়ে চলে যেতে পারবে তারা।

তখন প্রেমিক যুবক অনুরোধ করল, তিন দিন পরেই ধাওয়া করা হোক। খালিদকে একটি শর্টকাট বাতলে দেয়ার প্রস্তাব করে সে।

অবশেষে রাজি হলেন খালিদ। মুসলিমরা পেয়েও গেল সেই পলাতক কাফেলাটিকে। কিন্তু যুবকটির মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা জানতে পেরে মেয়েটি তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে এবং আত্মহত্যা করে।[১৪]

দেখলেন, নারী তার স্বভাবজাত কোমলতা দিয়ে কীভাবে প্রতাপশালী পুরুষকে কাবু করে ফেলে? আল্লাহই নারীদের দিয়েছেন এ ক্ষমতা।

এখন এই ক্ষমতা নিয়ে আমাদের কী করা উচিত?

ক্ষমতার সাথে আসে দায়িত্ব।

দুটি পরামর্শ দিচ্ছি :

• নারীদের অবশ্যই তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে, যাতে এ ক্ষমতার অপব্যবহার না হয়।

এ কারণেই আমরা পর্দা করি। নারী ও পুরুষের অবস্থান ও কর্মক্ষেত্র ভিন্ন, যদি না সত্যিকারের কোনো ব্যতিক্রমী প্রয়োজন দেখা দেয়। কথোপকথন করতে হলে সেটা হবে শ্রদ্ধা এবং হায়া সহকারে। নারীর পোশাক হতে হবে পর্দার বিধান অনুযায়ী এবং পুরুষের দৃষ্টি থাকবে অবনত।

তাই বোনেরা, পর্দা রক্ষায় তৎপর থাকুন। স্বামী ছাড়া কারও প্রতি আপনার কমনীয়তা বা নারীত্ব প্রদর্শন করবেন না।

• আর বাড়িতে স্বামীর ওপর এই ক্ষমতা ফলাবেন একদম লাগামহীনভাবে!

---

[১৪] আহমাদ মুহাম্মাদ কামিল; সাইফুল্লাহিল মাসলূল, ১২৮-১৩০। ঘটনাটি আরবে খুব প্রসিদ্ধ। যুবকটির নাম ইয়ুনান বিন মারকূস বা ইউনুস বিন মারকাস (জোনস মারকেস)। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী ﷺ ইউনুস বিন মারকাস নামক জনৈক রোমানের সাথে খালিদ রা.-এর চুক্তির ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তবে তা এমন নয়। ফুতুহুশ শাম, ১/৭২,৭৩

# নারীত্ব থেকে স্ত্রীত্ব

- উম্মে খালিদ

এতক্ষণ আমরা 'নারীত্বে'র সাধারণ ধারণা নিয়ে আলাপ করেছি। দেখিয়েছি এর অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক, দৃশ্যমান-অদৃশ্য দিকগুলো।

এবার আসুন তত্ত্ব ছেড়ে জীবনে। নারীত্ব, পুরুষত্বকে কী দিতে সক্ষম? স্ত্রীর কাছে স্বামী সবচেয়ে বেশি কোন বিষয়টির আশা ও প্রয়োজনবোধ করেন?

আমি মনে করি একজন মুসলিম স্ত্রী তার স্বামীর জন্য এই পাঁচটি কাজ করতে পারেন।

## ১. বিশ্বস্ততা রক্ষা

স্ত্রীর বিশ্বস্ততা এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা স্বামীর সবচেয়ে অমূল্য প্রাপ্তি। আস্থা যে বিয়ের ভিত্তি, সেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাদের জীবনসাথির ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করেন। যেসব জিনিস না থাকলে সম্পর্ক টেকে না, সেগুলোর প্রথমটিই হলো বিশ্বাস। ড. জন গটম্যানের মতো রিলেশনশিপ এক্সপার্টরা তাদের গবেষণায় এ বিষয়টি দেখিয়েছেন।

স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই যেন অনুভব করতে পারেন যে, তারা একে অপরের প্রতি নিষ্ঠাবান। অর্থাৎ তারা সঙ্গীর কাছে প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, পরকীয়া বা অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে নিরাপদ।

সুতরাং নিশ্চিত করুন যে, আপনি শুধু তারই। তার গোপন কথা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। বান্ধবীদের কাছে তার নামে বদনাম করবেন না । অন্যের সামনে তাকে হেয় করবেন না। অন্য পুরুষের কথা ভাববেন না। তার অনুপস্থিতিতে অন্য পুরুষের সামনে নিজেকে দেখিয়ে বেড়াবেন না।

সূরা আন-নিসার এই আয়াতে আল্লাহ আমাদের বলেছেন যে, একজন ধার্মিক স্ত্রী স্বামীর উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি উভয় ক্ষেত্রেই তার অনুগত।

"সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগত এবং বিনম্র। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তারা তার অধিকার ও

গোপন বিষয় রক্ষা করে। আল্লাহই গোপনীয় বিষয় গোপন রাখেন।"[১৫]

২. নিজেকে সুন্দরভাবে সাজান

আমরা সবাই এই কথাটা শুনেছি, *"men are visual creatures."*

আসলেই কিন্তু।

তাই স্ত্রীগণ, ঘরে আপনার সৌন্দর্যের দিকে একটু খেয়াল করুন। চাপ নিতে বলছি না। হয়তো তিনটি ছোট বাচ্চা আপনাকে টানাহ্যাঁচড়া করছে, কানের কাছে চিৎকার করছে, আপনার চোখেমুখে হাঁচি দিচ্ছে। এমন অবস্থায় আপনাকে প্রতিদিন হাইহিল পরে হাঁটতে হবে বা সুন্দর পোশাক পরতে হবে, এমন না। কিন্তু মাঝেমধ্যে সুযোগ পেলে তো তা করাই যায়।

স্বামীর কাছে সুন্দর দেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী দায়িত্ব। এটি মোটেও লজ্জাজনক বা অমার্জিত কাজ নয়। কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত তো নয়ই। এক বোন আমাকে একবার বলেছিল যে, সে নাকি এ রকমটাই বিশ্বাস করে! অথচ হাদীসে কী বলা হয়েছে দেখুন :

**আয়মান ﵁ বলেন, "একদিন আয়িশার কাছে গেলাম। তাঁর পরনে ছিল পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা কাপড়ের একটি কামিজ। তিনি আমাকে বললেন, 'আমার এই দাসীও ঘরের ভেতরে এটা পরতে চায় না। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় সারা মদীনায় আমারই শুধু এ রকম একটি কামিজ ছিল। মদীনায় কোনো মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজাতে গেলেই আমার কাছে কাউকে পাঠিয়ে চেয়ে নিত এই কামিজটি।'"[১৬]**

এ ছাড়াও আমাদের মা আয়িশা ﵂-এর অন্য একটি হাদীস থেকে জানা যায়,

**আয়িশাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "কোন ধরনের নারী সবচেয়ে উত্তম?" তিনি বলেছিলেন, "যে খারাপ কথা বলতে জানে না এবং পুরুষদের মতো ধূর্ত নয়। তার মনোযোগ কেবল স্বামীর জন্য নিজেকে সাজিয়ে তোলা এবং পরিবারের যত্ন নেয়ায়।"**

---

[১৫] সূরা আন-নিসা, ৩৪

[১৬] সহীহ আল বুখারী, ২৬২৮

বেশির ভাগ নারী স্বভাবতই সাজসজ্জা পছন্দ করেন। চান নিজেকে সুন্দর দেখাতে এবং সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনতে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই উপভোগ করে, এমন জিনিস এটি। তাহলে আপনার স্বামীর জন্যই মাঝেমাঝে সাজগোজ করুন না!

এ ছাড়াও আপনার হাসি এবং প্রফুল্লতাও আপনার সৌন্দর্যের অংশ। আপনার প্রফুল্লতা এবং রসিকতাবোধ স্বামীর চোখে আপনার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয়।

মিসরীয় স্ত্রীরা نكد (নাকাদ) করার জন্য বিখ্যাত। আমি এটাকে বলি ঘ্যানঘ্যান করা। মিসরীয় সোপ অপেরায় প্রায়ই দেখানো হয় যে, এটা-ওটা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করতে করতে স্ত্রীরা স্বামীদের দম আটকে মরার মতো অবস্থা করছে।

এ রকমটা করবেন না। সুন্দর পোশাক পরুন, একটু মেকআপ লাগান, হাসিখুশি থাকুন। আপনার স্বামীর এটা ভালো লাগবে!

## ৩. স্বামীর আনুগত্য করা এবং তার কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া

আধুনিকমনাদের কানে কথাটা শ্রুতিকটু লাগে। কারণ, 'আনুগত্য' শব্দটাকেই নেতিবাচকভাবে দেখে বেশির ভাগ আধুনিক মানুষ। চোখে ভেসে ওঠে সামন্ততন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্র, ভূমিদাসত্ব সবকিছু। আমরা নিজেকে 'মুক্তচিন্তার অধিকারী', 'স্বাধীন' ইত্যাদি ভাবতে ভালোবাসি।

তবে বাস্তবতা হলো, আমরা সবাই কিছু-না-কিছু বা কারও-না-কারও আনুগত্য করি। জেনে হোক বা না জেনে। নিকৃষ্টতম আনুগত্য হলো শয়তান এবং নিজের নাফসের আনুগত্য। আনুগত্যের সর্বাধিক হকদার এক আল্লাহ। মুসলিম স্ত্রীর জন্য এর পরপরই আসে হালাল বিষয়ে স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারটি। যতক্ষণ সে একজন ধার্মিক এবং তাকওয়াবান ব্যক্তির সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ, ততক্ষণ মুসলিম স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য করবে।

**আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেছেন যে, ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "কেমন স্ত্রী শ্রেষ্ঠ?"**

**তিনি বলেছিলেন, "যার দিকে তাকালেই মন ভরিয়ে দেয়, কথা শোনে এবং নিজের ও তার ধন-সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় না।"[১৭]**

স্বামীকে বুঝতে দিন যে আপনি তাকে সম্মান করেন। তাকে ভালোবাসেন। ছোট ছোট

[১৭] সুনানু নাসাঈ, ৩২৩২। মুসনাদু আহমাদ, ৭৪২১। হাসান সহিহ

এমন কাজ করুন, যা আপনি জানেন তাকে সন্তুষ্ট করবে।

আপনার স্বামীর প্রেমের ভাষা কী?

ড. গ্যারি চ্যাপম্যানের *‘দ্য ফাইভ লাভ ল্যাঙ্গুয়েজস’* নামে একটি বই আছে। চ্যাপম্যানের মতে, ভালোবাসা প্রকাশ করা ও ভালোবাসা পাওয়ার পাঁচটি উপায়কে ‘প্রেমের ভাষা’ বলা হয়। সেগুলো হলো :

- স্বীকৃতি
- সময় কাটানো
- উপহার প্রাপ্তি
- সেবাযত্ন
- শারীরিক স্পর্শ

আপনার স্বামীর পছন্দের প্রেমের ভাষাগুলো শিখে নিন। এটি প্রদর্শন করুন আপনার যত্নের মাধ্যমে। হঠাৎ একদিন কোনো উপহার দিয়ে চমকে দিন বা তার প্রশংসা করুন। তার ভালো কাজের স্বীকৃতি দিন। কিছু সময় নির্ধারণ করুন একান্তই আপনাদের দুজনার।

## ৪. শারীরিক ঘনিষ্ঠতা

ইসলামে বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নারী-পুরুষ সকল মুমিনের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা। বিশেষ করে বর্তমানে আমাদের পর্ন-আসক্ত, নগ্নতায় ভরপুর আধুনিক সমাজে এর গুরুত্ব অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

ব্যভিচারের মতো মারাত্মক পাপের হাত থেকে রক্ষা ছাড়াও বৈবাহিক ঘনিষ্ঠতা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বন্ধনকে জোরদার করে। অনেক লেখালেখি হয়েছে এ বিষয়ে। শারীরিক ঘনিষ্ঠতা অক্সিটোসিন বা তথাকথিত “লাভ হরমোন” তৈরি করে। আরও উৎপাদন করে অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান, যা সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় করে, বাড়ায় সুখশান্তি।

“... যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে নারীদের নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করতে। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, সেই সত্তার কসম!

কোনো নারী আল্লাহর প্রতি তার কর্তব্য ততক্ষণ সম্পাদন করতে পারে না যতক্ষণ না সে তার স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে। তার স্বামী যদি তাকে একান্ত সময়ের জন্য ডাকে তবে তার সেটা অস্বীকার করা উচিত নয়। এমনকি উটের পিঠে থাকলেও না।"[১৮]

এই হাদীসটি দুটি বিষয়ে জোর দেয়। স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং স্বামীর প্রতি সম্মান ও আনুগত্য।

## ৫. ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো!

সংসার সামলানোর জন্য নারীদের ঘরে থাকার ধারণাটি আধুনিক নারীবাদী সমাজে রীতিমতো গর্হিত। নিজেকে স্বাবলম্বী, স্বাধীন মনে করা নারীরা এর কথা শুনলেই বলেন, "গৃহিণী?? অসম্ভব!!"

আমি এসব জানি, কারণ আমিও তাদের মতোই ভাবতাম একসময়। তবে আমি আলহামদুলিল্লাহ সেই মানসিকতা ছেড়ে এসেছি। অবতীর্ণ হয়েছি স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকায়। ঘরের দুর্গটি সামলাচ্ছি খুব গুরুত্ব সহকারে।

সমাজ আমাদের ব্রেইন ওয়াশ করে যে, ঘর সামলানো মানে নিতান্ত নিষ্কর্মা থাকা। কাপড় ধোয়া, বাসন ধোয়া, খাবার রান্না করা, মেঝে পরিষ্কার করা, টয়লেট পরিষ্কার করা এবং সদাইপাতি কিনে আনার মতো কাজগুলোকে দেখা হয় অর্থহীন শ্রম বা সাংসারিক গোলামি হিসেবে। উচ্চশিক্ষিত নারীর জন্য উপযুক্ত মনে করা হয় না এগুলো।

"সে কি দাসী নাকি, অ্যাঁ?"

না, তিনি স্ত্রী। এটি একটি ফুলটাইম জব। স্ত্রী হওয়া মানে একটি পরিবারের জন্য সহজ জীবন নিশ্চিত করা। সে উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন ছোটবড় নানা কাজ পরিচালনা করা। আপনার স্বামী পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে কাজ করছেন (যা তার ইসলামী দায়িত্ব এবং স্ত্রী হিসাবে আপনার অধিকার)। আর এদিকে আপনি তৈরি করছেন একটি শান্ত, সুসংগঠিত গৃহ।

---

[১৮] সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৮৫৩

বলছি না যে, এই সমস্ত কাজ নিজেই করা উচিত। চাইলে ও সামর্থ্য থাকলে গৃহকর্মী রাখতে পারেন। তবে তদারকি করা এবং কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা আপনার দায়িত্ব।

আপনার স্বামী ৯ টা থেকে ৫ টা বাড়ির বাইরে কাজও করবেন, ট্যাক্স-বিল পরিশোধ করবেন, আবার ঘরে এসে নিজের খাবারও তাকেই রান্না করতে হয়—এটি ন্যায়সংগত নয়।

আল্লাহ আপনাকে সন্তান দান করলে কাজ বহুগুণে বেড়ে যায়, জানি। বাচ্চাদের সাধ্যমতো সর্বোত্তম যত্ন নেওয়া, লালনপালন করা, দ্বীন শেখানো এবং তাদের শারীরিক, ধর্মীয়, মানসিক চাহিদা পূরণ করাও ঘর সামলানোর আরেকটি দিক।

তবে আপনি একা নন।

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এটা একটা যৌথ প্রয়াস। একটি উত্তম মুসলিম পরিবার গড়ে তোলা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মিলিত সংগ্রাম। স্বামী ও স্ত্রী একটি টিম। তারা একই মাঠের আলাদা অর্ধে খেলে বটে। তবে প্রয়োজন হলে একজনের অর্ধে অপরজনের আসতে মানা নেই।

হাইস্কুলে থাকতে টেনিস খেলতাম। ডাবল টেনিসের চেয়ে সিঙ্গেল টেনিস খেলতেই পছন্দ করতাম বেশি। ডাবল টেনিস খেলা মানে দুজনে জোটবেঁধে আরেকটি দলের বিরুদ্ধে খেলা।

আমার ভালো লাগত না এটা। কারণ, এতে হেরে যাওয়া খুব সহজ। মাঝেমাঝে বল আসে ঠিক মাঝখান দিয়ে। এ মনে করে ও মারবে, ও মনে করে এ। শেষমেশ কেউই ব্যাট চালায় না। তাকিয়ে থাকে বোকার মতো। বল কোর্টে পড়ে যায়। ফলস্বরূপ পয়েন্ট হারায় দলটি।

বিয়ে কিছুটা ডাবল টেনিস খেলার মতো। জয়লাভের জন্য সুষমভাবে দায়িত্ব ভাগাভাগি যেমন করতে হবে, তেমনি থাকতে হবে সঙ্গীর সাথে সুস্পষ্ট বোঝাপড়া। দুজনকে অবশ্যই সমন্বয় করে কাজ করতে হবে, যাতে কোনো কিছু হারাতে না হয়। প্রত্যেককে সঠিকভাবে জানতে হবে অন্যজন কী করতে চায়। আপনারা একই দলে আছেন। তবুও কথা বলে জেনে নিতে হবে কার কী প্রত্যাশা। যখন প্রয়োজন, তখন সাহায্য চাইতে হবে খোলাখুলি।

শুধু স্ত্রীর ভূমিকা নিয়েই বলেছি, কারণ বোনেরাই মূলত আমার কাঙ্ক্ষিত পাঠক। তবে অবশ্যই স্বামীদের নিজস্ব ভূমিকা এবং কাঁধে অনেক দায়িত্ব আছে। সুখী দাম্পত্য-জীবনের জন্য স্বামী ও স্ত্রীকে একসাথে কাজ করা উচিত।

আল্লাহ আমাদের উত্তম স্ত্রী হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং আমাদের স্বামীদের উত্তম স্বামী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের সহায়তা করুন এমন দৃঢ় ঈমানসম্পন্ন মুসলিম উম্মাহ গড়ে তুলতে, যারা দ্বীনের ওপর অটল থাকবে। আমীন।

# কড়া নেড়ো না ভুল দরোজায়

-উম্মে খালিদ

বোনেরা, একজন সুগৃহিণী এবং ভালো মা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা লালন করুন নিজের অন্তরে। বিনম্র স্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখুন, যিনি হবেন তার স্বামীর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস এবং স্বামীর অনুগতা। ভালো রাঁধুনি হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করুন। মনের মধ্যে রাখুন একটি সুন্দর পরিবারের কর্ত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সন্তান ধারণ এবং তাদের ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করার আকাঙ্ক্ষা। সচ্চরিত্র, সুবিবেচক এবং উত্তম আখলাকের নারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা লালন করুন, বোন। স্বামী ও সংসারের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষা লালন করুন। আল্লাহর অনুগত গোলাম, ধার্মিক মুসলিম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা লালন করুন। এমন একজন হোন, যিনি বিয়ে করতে চান উত্তম নিয়ত সহকারে। সুন্নাহর অনুসরণ, সুকূনের সন্ধানে এবং জান্নাতের প্রত্যাশায়।

ক্যারিয়ারিস্ট নারী হতে হবে না। দরকার নেই উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত শিক্ষার্থী হওয়ার। বহু চড়াই-উতরাইয়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্না, বিরাট জনগোষ্ঠীর নেত্রী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবেন না মনে।

আমি জানি, ওপরের কথাগুলো অনেককেই ক্ষেপিয়ে দেবে। তারা বলবে, "তাহলে নিজে হার্ভার্ডে পড়লেন কেন!!"

সত্যি বলতে প্রত্যেক পুরুষ এসবই চান তার স্ত্রীর কাছ থেকে। আর প্রত্যেক নারীই সত্যিকার অর্থে সুখী হওয়ার জন্য চান ঠিক এই জিনিসগুলোই। সংস্কৃতিতে যত পরিবর্তনই আসুক না কেন, মানুষের প্রকৃতি একই থাকে।

আমাদের দাদি-নানি এবং তাদের মায়েরা জানতেন সেই বুনিয়াদি সত্য। এটাই হয়ে আসছে। পুরুষেরা অর্থ উপার্জন করেন। আর নারীরা সাজিয়ে তোলেন সংসার। পুরুষ জোগানদাতা এবং সুরক্ষাদাতা। আর নারী লালন-পালনকারী এবং সৌন্দর্য বর্ধনকারী। পুরুষরা বাইরে থেকে রসদ আনেন। নারীরা ঘর নামক দুর্গটাকে আগলে রাখেন।

দুটোই কাজ। পুরুষরা শারীরিকভাবে শক্তিশালী। নারীরা শক্তিশালী মানসিকভাবে। পুরুষের পছন্দ নারীসুলভ কোমল নারী। নারী চান পৌরুষময় বলিষ্ঠ পুরুষ। এটা জটিল কিছু নয়।

তবে আমরা আধুনিক মুক্তমনা, স্বতন্ত্র এবং ক্ষমতায়িত নারীরা নিজেদের মায়েদের বিচক্ষণতার কিছুই পাইনি। দুর্দশায় উপনীত হয়েছি নিজেদের কর্মফলের কারণেই। আমরা শিক্ষার, ক্যারিয়ারের, সমতার ফাঁদে আটকে গিয়েছি অত্যন্ত বাজেভাবে। এই বিষয়গুলো থেকে একেবারেই দূরে থাকতে বলছি না। বলছি এগুলোকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু না বানাতে।

বিয়ের বদলে বছরের পর বছর ধরে উচ্চশিক্ষা বা ক্যারিয়ারের প্রতি অতি-মনোযোগ আপনার জীবনের সেরা এবং সবচেয়ে সুন্দর সময়টুকু ছিনিয়ে নেবে।

অন্তরের গভীর থেকে প্রায় প্রত্যেকটি নারী চায় তার বিয়ে হোক। সে চায় কোনো পুরুষের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং স্থিতিশীল সম্পর্ক। সে চায় এমন একজন পুরুষ, যে তাকে ভালোবাসবে, তার যত্ন নেবে। যার অন্তরে আছে তাকওয়া। সে চায় তার সন্তানদের জড়িয়ে থাকার আনন্দ এবং একটি সুখী সংসার।

সব চাওয়া পূরণ হয় না জানি। তবে কী চাইতে হবে, সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ। ত্রুটিপূর্ণ চিন্তা লালনের ফলে যদি সব ভুল জিনিসের জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা করে বসে থাকি, তাহলে সত্য সুখের দেখা পাব কীভাবে?

# অনাস্থা

-উম্মে খালিদ

ফেমিনিজমের কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি বিরক্তিকর জানেন? ফেমিনিজমের ভিত্তি হলো আস্থার তীব্র অভাব। এটি সক্রিয়ভাবে একাধিক স্তরে অনাস্থার বীজ বপন করে।

যেহেতু পুরুষতন্ত্র নারীদের ওপর অত্যাচার করে, তাই নারীদের অবশ্যই আরও বেশি অধিকারের দাবি করতে হতে হবে–এটাই নারীবাদের শিক্ষা। আরও বেশি ক্ষমতা হাতে পেতে হবে।

কেন? নারীদের কেন আরও বেশি ক্ষমতা লাগবে? কিছু নারী কিছু পুরুষের মতোই ক্ষমতার জন্য লালায়িত। তারা ক্ষমতার খাতিরেই ক্ষমতা চায়। ক্ষমতাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এর নাম আসলে লোভ।

তবে সবার ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। কেউ কেউ ক্ষমতা চায় নিজেদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে। চায় যে, তাদের স্বাভাবিক চাহিদাটুকু পূরণ হোক। কিন্তু এ কাজে তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে না। তত্ত্বাবধায়ক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসেবে পুরুষদের ওপর তাদের আস্থা নেই।

এই অনাস্থার কারণ হলো জীবনে কোনো নির্ভরযোগ্য পুরুষের সংস্পর্শে না আসা। নারীটি কখনো হয়তো এমন কোনো পুরুষ দেখেননি বা এমন কারও সাথে থাকেননি, যিনি তার যত্ন নিয়েছেন, পূরণ করেছেন তার প্রয়োজন কিংবা দিয়েছেন সুরক্ষা।

হতে পারে তার বাবা ছিল দায়িত্বজ্ঞানহীন বা অপব্যয়কারী। হয়তো তার স্বামী একজন স্বার্থপর, অযোগ্য লোক। তাই জীবনে কখনোই তিনি পুরুষের কাছ থেকে ন্যায়বিচার বা দয়ামায়া, সুরক্ষা এসব পাননি।

ইসলামে পরিবার ও দেশের নেতৃত্ব পুরুষদের হাতে থাকে, এই তথ্য জানামাত্রই তাই আঁতকে ওঠেন তিনি। বুঝেই উঠতে পারেন না যে, এ রকম কোনো ব্যবস্থার আওতায় তার নিজের প্রয়োজন কীভাবে পূরণ হতে পারে। তিনি তো কখনো কোনো

পুরুষকে তার দায়িত্ব পালন করতেই দেখেননি। তিনি চান সবকিছু নিজের হাতে নিতে। ছেলেদের তো বিশ্বাস নেই!

কিন্তু উক্ত ব্যবস্থার আদেশদাতা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, قوامة الرجال على النساء। এর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা মানে শুধু পুরুষের প্রতি আস্থাহীনতা নয়, আল্লাহর প্রতিও অনাস্থা।

আল্লাহ আল-হক (ন্যায়বিচারক)। আল-হাকিম (প্রজ্ঞাময়, নিখুঁত বিচারক)। তাঁর ন্যায়বিচার, প্রজ্ঞা ও পরম জ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখলে চিন্তার কোনোই কারণ নেই।

আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা, নারীরও স্রষ্টা। সমস্ত সৃষ্টিকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন তিনি। এই বাস্তবতা গভীরভাবে উপলব্ধি করার অর্থ হলো, আল্লাহকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে সমস্ত বিষয় তাঁর কাছে অর্পণ করা। আল্লাহ আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখেন। তাই আমরা কোনো নিয়ন্ত্রণ চাই না। এটিই তাওয়াক্কুল।

উমর ইবনে আল-খাত্তাব ﷺ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের যদি আল্লাহর প্রতি যথাযথ তাওয়াক্কুল থাকত, তাহলে তিনি পাখির মতো তোমাদের রিযিক সরবরাহ করতেন। পাখিরা বাসা ত্যাগ করে ক্ষুধার্ত অবস্থায় এবং ফিরে আসে ভরাপেটে।"[১৯]

হাজেরা আলাইহাস সালাম অনুর্বর মরুপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর সন্তানকে আঁকড়ে ধরে। তার স্বামী সাইয়্যেদিনা ইব্রাহিম ﷺ-কে সেখান থেকে চলে যেতে দেখছিলেন তিনি। প্রশ্ন করলেন, "এই কাজ করার আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন?"

তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।"

হাজেরা বললেন, "তাহলে তিনি কখনোই আমাদের পরিত্যাগ করবেন না।"

অতঃপর তিনি ফিরে তাকালে ইব্রাহিম ﷺ চলে গেলেন।

হাজেরা একজন নারী, একজন স্ত্রী এবং একজন মা। ছিলেন একজন পুরুষের দায়িত্বাধীনে। যিনি তাঁর স্বামী এবং তাঁর সন্তানের পিতা। কোলে ছোট বাচ্চা। চারপাশে খাবার-পানিবিহীন মরুপ্রান্তর। কঠিনতম অবস্থা। এ অবস্থায় কি না তাঁকে রেখে চলে যাচ্ছেন স্বামী! হাজেরার কাছে দুনিয়ার সব কারণ ছিল স্বামীসহ সব পুরুষকে অবিশ্বাস

[১৯] সুনানু তিরমিযি : ২৩৪৪

করার।

কিন্তু তাঁর কাছে তা যাচাইয়ের একটা মানদণ্ড ছিল। আল্লাহ এই আদেশ করেছেন কি না।

স্বামীর কাছ থেকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান। আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল ছিল তাঁর। তিনি জানতেন যে, আল্লাহ তাঁকে এই ভীষণ সংকটে অযত্নে ফেলে রাখবেন না। এটাই প্রকৃত ঈমান।

কিন্তু ঈমানের লেন্সের পরিবর্তে নারীবাদের লেন্স দিয়ে দুনিয়াকে দেখলে বিকৃত একটি ছবি ভেসে ওঠে। আমেরিকান নারীবাদী আমিনা ওয়াদুদ তাই হাজেরার এই দৃঢ়তার সমর্থন তো করলেনই না। উলটো হযরত ইব্রাহিম ﷺ-কে বললেন "ব্যর্থ বাবা!" একজন মুসলিম দাবিদারের মুখ থেকে এই কথা বের হচ্ছে। কারণ, তিনি ওই "সব পুরুষ খারাপ" নীতির অন্ধভক্ত। আল্লাহ আমাদের এ ধরনের আত্মবিধ্বংসী নারীবাদ থেকে হেফাযত করুন।

নারী হিসেবে হয়তো পুরুষদের ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা ভালো নয়। হয়তো তাদের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা পেয়েছেন আপনি। তাহলেও অন্তত আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখুন। স্বামীর তত্ত্বাবধান বা পুরুষের নেতৃত্বের বিধান নিয়ে যদি মনে খচখচানি থাকে, তাহলে হাজেরা আলাইহাস সালাম এর মতো একই প্রশ্ন করুন, "এ আদেশ কি আল্লাহ দিয়েছেন?" উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে আত্মসমর্পণ করুন আল্লাহর জ্ঞান ও করুণার কাছে। হাজেরা ﷺ-এর কথাটি মনে রাখবেন :

إذن لا يضيعنا

"তাহলে তিনি কখনোই আমাদের পরিত্যাগ করবেন না।"[২০]

---

[২০] সহিহ বুখারি : ৩৩৬৪

# মিসরীয় জাদুমন্ত্র

-উম্মে খালিদ

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে জেন্ডার রোল বিভিন্ন রকম। আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের মতো পশ্চিমা দেশগুলোতে *"ট্র্যাডওয়াইফ"* নামক একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে। ট্র্যাডিশনাল ওয়াইফ থেকে সংক্ষেপ করে *'ট্র্যাডওয়াইফ'*। স্বামী-স্ত্রীর সমতার কাঠখোট্টা পশ্চিমা সংজ্ঞা নিয়ে যে অমুসলিমরা অসন্তুষ্ট, তারই প্রমাণ এই আন্দোলন।

তারা যে ধরনের জেন্ডার রোলের উপকারিতা এখন বুঝতে পারছে, ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজগুলোতে সেটা বহু আগে থেকেই সমাদৃত। নিচের লেখাটির কথাই ধরুন। আরব সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এ লেখাটি একজন মিসরীয় নারীর। কীভাবে উত্তম স্ত্রী হওয়া যায়, তা নিয়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন তিনি এখানে।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : লেখাটির সাথে নিজের মিল না পেলে নিজেকে 'খারাপ স্ত্রী' ভেবে বসবেন না যেন! আবার এখানে উল্লেখিত প্রতিটা কাজই যে প্রতিদিন করতে হবে বা করতে পারবেন, এমনও নয়। তা ছাড়া কিছু বিষয় একেক সংস্কৃতিতে একেক রকম। কিন্তু যদি একটি-দুটি জিনিসও প্রয়োগ করেন, দেখবেন আপনার স্বামীর ওপর জাদুর মতো কাজ হবে ইনশাআল্লাহ। আর হ্যাঁ, কৌতুকের ভঙ্গিতে লেখা হলেও পরামর্শগুলো কিন্তু দরকারি!]

"স্বামী জেগে ওঠার মোটামুটি আধঘণ্টা আগেই জেগে উঠুন। মুখ ধুয়ে নিন, দাঁত ব্রাশ করুন। করে নিন হালকা একটু মেকআপ।

এরপর নাস্তা তৈরিতে মন দিন। পেট ভরানোর মতো কিছু যদি বাসায় না থাকে, সমস্যা নেই। হাতের কাছে যা আছে, তা-ই পরিবেশন করুন সুন্দরভাবে। স্বামী যেন খালি পেটে বাইরে না যান, এতটুকু নিশ্চিত করুন। ব্যস।

বাথরুমে তার জামাকাপড়, তোয়ালে প্রস্তুত রাখুন। প্রয়োজনে সেগুলোতে একটু সুগন্ধি লাগিয়ে দিন। সময় থাকলে বালতি বা টাবে পানি ভরিয়ে রাখুন আগে থেকেই।

তারপর তাকে জাগিয়ে তুলুন। তবে আস্তে-ধীরে। শোরগোল করার দরকার নেই। কাঁথা বা কম্বল এক ঝটকায় টান মেরে সরাবেন না। 'জান, সোনা, ডার্লিং' ইত্যাদি যেসব আদরের ডাক আপনার ভাষায় বা সংস্কৃতিতে প্রচলিত, সেসব বলে আলতোভাবে ঘুম ভাঙাবেন।

তিনি ওয়াশরুমে থাকা অবস্থাতেই তার জামাকাপড় প্রস্তুত রাখুন। মোটকথা, তাকে রেডি হতে যতভাবে সহায়তা করা সম্ভব। তার জুতা-মোজা পরিষ্কার রাখলে বা পরতে সাহায্য করলে আপনার সম্মান কমবে না তাতে। আল্লাহর কসম, কমবে না।

একসাথে নাস্তা করুন দুজনে। বেরোনোর সময় তাকে দরজার দিকে এগিয়ে দিন। চুমু দিন, আদর করুন, দুআ করুন তার জন্য। বলুন, "মিস ইউ! তাড়াতাড়ি চলে আসবেন কিন্তু, হ্যাঁ?"

আল্লাহর কসম, তিনি কী যে খুশি হবেন! সারাদিন তার মন থাকবে চনমনে। অফিসের কাজও যেমন স্বাচ্ছন্দ্যে করবেন, তেমনি বাড়ি ফিরে আসতেও থাকবেন উদগ্রীব। কারণ, আপনি তো তাকে সেভাবেই জাদু করে দিয়েছেন!

তিনি চলে যাওয়ার পরে একটু ঘুমান বা বিশ্রাম নিন। আবার ফিরে আসার আগেই পরিপাটি করে রাখবেন ঘরটা। খাবার প্রস্তুত করুন। সুন্দর কোনো জামা পরুন, চুল আচড়ান। সুগন্ধি লাগান, মেকআপ করুন। এয়ার ফ্রেশনার স্প্রে করুন বা বাখুর জ্বালান।

মনে রাখবেন, সৌন্দর্য মানেই কেবল চেহারা বা সাজগোজ নয়। সৌন্দর্য নিহিত আপনার কোমলতায় এবং আন্তরিক ভালোবাসায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ও সুবাসে। তেমনি ঘরটাকেও সুন্দর করে সাজানো যায় কোনোরকম অপব্যয় ছাড়াই। সুন্দর করে টেবিল সাজান। এমন আকর্ষণীয়ভাবে খাবার পরিবেশন করুন, যেন দেখেই রুচি বেড়ে যায়। নিজের ছাপ রাখুন সব কাজে। দেখবেন স্বামীর মনে গেঁথে থাকবে তা।

আপনি ক্লান্ত থাকলে বা ঝামেলায় থাকলেও হাসিমুখে তাকে স্বাগত জানান। তিনি একটু সুস্থির হওয়ার আগ পর্যন্ত ঝামেলাগুলো লুকিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ।

তাকে কিছু নিয়ে অস্থির বা চিন্তিত মনে হলে 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?' করে ব্যস্ত হবেন না। স্বাভাবিক কাজকর্ম করার ফাঁকে ফাঁকেই চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে বুঝিয়ে দিন যে, আপনি বিষয়টা খেয়াল করেছেন। দেখবেন নিজে থেকেই তিনি বিষয়টা শেয়ার করবেন তখন। সমাধান দেওয়ার জন্যও ব্যস্ত হতে হবে না। স্রেফ শুনে যান

আর যৌক্তিক আচরণ করুন। কিছু নিয়ে আবদার করতে চাইলে উপযুক্ত সময় ও তার সামর্থ্য অনুসারে করবেন।

মনোমালিন্য হলে প্রতিটা কথায় জবাব দেবেন না। ধৈর্য রাখুন কিছুক্ষণ। প্রয়োজনে একশ পর্যন্ত গণনা করুন মনে মনে। মানুষের একসময় অভিমান নেমে যায়। রূঢ় জবাব না পেলে তিনিই একসময় এগিয়ে আসবেন ক্ষমা চাইতে। এবার তাকে নরম হতে দেখে একদম পেয়ে বসবেন না যেন। বলবেন, "মাফ চাইতে হবে না! আমি কি পারি আপনার সাথে রাগ করে থাকতে?"

শোয়ার সময় তার মাথা আপনার বুকে নিয়ে কোরআন তিলাওয়াত করুন। কোমলকণ্ঠে তার কানে ফিসফিসিয়ে তার জন্য দুআ করুন।

বাড়িতে সুন্দর গয়নাগাটি পরে থাকবেন। ব্রেসলেট পরুন, গায়ে নকল ট্যাটু আঁকুন। চুলে রঙিন ক্লিপ বা ফুল লাগাতে পারেন।

মোটকথা, নিজের নারীত্বকে উদ্ভাসিত হতে দিন স্বামীর জন্য।

সর্বোপরি নেক আমলে নজর দিন। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার রাখুন ঘরকে।

আল্লাহ আপনার বিবাহে সবরকম কল্যাণ দান করুন। আপনার স্বামীকে সর্বদা আপনার জন্য হিফাজত করুন, আমীন।"

# কৃতজ্ঞতা

-উম্মে খালিদ

প্রশংসা শুনতে কে না পছন্দ করে? নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবাই। ভালো কিছু করলে স্বাভাবিকভাবেই সবাই চায় প্রশংসা ও স্বীকৃতি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য প্রত্যেক সংস্কৃতিতে রয়েছে নির্দিষ্ট শব্দ কিংবা অঙ্গভঙ্গি।

স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি প্রযোজ্য। বিবাহিত জীবনকে সফল করতে হলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অবশ্যই কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে।

তবে এই লেখাটি যেহেতু বোনদের উদ্দেশে, তাই আপাতত শুধু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কৃতজ্ঞতাবোধ নিয়ে কথা বলা যাক।

সহীহ্ বুখারীর এই হাদীসে বলা হয়েছে,

ইবনে আব্বাস ﵄ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন,

"আমাকে জাহান্নামের আগুন দেখানো হলো। সেখানকার বাসিন্দাদের বেশির ভাগই নারী, যারা কুফর করে।"

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "তারা কি আল্লাহর প্রতি কুফর করে?"

তিনি জবাব দিলেন, "না, স্বামীর প্রতি। তারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ্ ও সদাচরণের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ। আজীবন সদাচরণ পাওয়ার পর একটা অপছন্দের জিনিস দেখলেই বলে বসবে, 'তোমার কাছ থেকে তো জীবনেও ভালো কিছু পেলাম না।'"[২১]

হাদীসটি নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবুন। হুট করে বলে উঠবেন না, "ওহ্, আমি তো এ রকম না।" এ রকমটা কিন্তু হয়।

আমাদের প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাটা মনে গেঁথে নিন।

[২১] সহিহ্ মুসলিম : ৯০৭

কুফর শব্দটি নিতান্ত হালকা কোনো শব্দ নয়। এই শব্দের তীব্রতা এবং ওজনই এটা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট যে, বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

কুফর বিভিন্ন রকমের হয়। সবচেয়ে খারাপ কুফর হচ্ছে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস। তবে কুফর শব্দের অর্থ শুধু "অবিশ্বাস" নয়। এর আরেক অর্থ অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়া। আপনার ফিতরাত আপনাকে বলে, আল্লাহই আমাদের রব। ফিতরাতের এই কথাটা অস্বীকার করাই কুফর।

মানুষের প্রতিও কুফর করা যায়। অনুগ্রহ অস্বীকার করা কুফর। সৌজন্যকে অস্বীকার করা কুফর। কিছু মানুষ আছে, যারা খালি নিয়েই চলে, নিয়েই চলে। কখনো ধন্যবাদ দেয় না বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

পিতা-মাতার প্রতি অসম্মান বা অকৃতজ্ঞতা একটি গুরুতর পাপ। এটি জান্নাত লাভের প্রতিবন্ধক। আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে আল-কুরআনে আদেশ দিয়েছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

**"আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। এবং তার দুধ ছাড়ানোর বয়স দু-বছর। (আমি তাকে এ নির্দেশ দিয়েছি যে) আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (তোমাদের সবাইকে) অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।"[২২]**

এই হাদীসটি দেখুন। মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধকে একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

**"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"**

কৃতজ্ঞতার অভাব এবং অনুগ্রহের অস্বীকৃতি (কুফর) জাহান্নামিদের বৈশিষ্ট্য। দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক নারীর মধ্যে এই প্রবণতা রয়েছে।

নারীবাদীদের মতো একে সেক্সিস্ট বা নারীবিদ্বেষী বলে নালিশ করতে আসবেন না

[২২] সূরা লুকমান, ১৪

এখন। আমরা মুসলিমাহরা জানি যে এটা বাস্তবতা। আমাদের উচিত নিজেদের যাচাই করা। স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে রক্ষা করা নিজেকে।

আচ্ছা বিয়ের প্রসঙ্গ বাদ দিন। কর্মক্ষেত্রের কথায় আসুন।

হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউতে *"ম্যানেজিং পিপল"* নামে একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়,

"কাজ করে আমরা অনেক কিছুই অর্জন করতে পারি। কিন্তু কর্মী হিসেবে গুরুত্ব পাওয়াটাই সবচেয়ে মূল্যবান অর্জন। সামগ্রিকভাবে প্রত্যেকেরই যে অনন্য অবদান রয়েছে, সেটার স্বীকৃতির চেয়ে বড় কোনো প্রাপ্তি হতে পারে না।

টাওয়ার ওয়াটসনস পরিচালিত একটি বিশ্বব্যাপী গবেষণায় জানা যায় অসাধারণ এক বিষয়। ম্যানেজাররা তাদের কল্যাণ চায়—এই চিন্তাটিই শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। নিজে থেকে কাজের প্রতি আগ্রহ বোধ করেন ৪০ শতাংশেরও কম শ্রমিক।

সত্যিকারের প্রশংসা মানুষকে প্রেরণা দেয়। এতে আমরা নিরাপদ বোধ করি, যা আমাদের সুন্দরভাবে কাজ করতে সাহায্য করে।"

যে শ্রমিক জানে যে, তার বস তার কঠোর পরিশ্রমের মূল্যায়ন করছে, সেই শ্রমিক আরও বেশি নিবেদিত হয়। আরও কঠোর পরিশ্রম করে সে।

তাই সংসারের জন্য স্বামীর হাড়ভাঙা খাটুনির প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান। তাহলে তিনি আপনাদের সম্পর্ক ও বিয়ের প্রতি থাকবেন আরও বেশি নিবেদিত। আপনাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করার চেষ্টা আরও বাড়িয়ে দেবেন তিনি।

স্ত্রী তার স্বামীর প্রশংসা করলে জিতবে দুজনেই। স্বামী পাবে তার স্ত্রীর তরফ থেকে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাবোধ। আর স্ত্রী পাবেন তাকে খুশি রাখার জন্য তার স্বামীর দ্বিগুণ প্রচেষ্টা।

স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কিছু ছোট্ট কিন্তু বাস্তবসম্মত উপায় কী হতে পারে?

**১. মৌখিক :** তিনি আপনার জন্য ভালো কিছু করলে 'ধন্যবাদ/জাযাকাল্লাহ, প্রিয়' বলার অভ্যাস করুন। কথাটি বলা খুব সহজ হলেও হৃদয়ে এটি যে উষ্ণতা ছড়ায়, তা তুলনাহীন।

<u>২. শারীরিক :</u> হাসিখুশি থাকুন। আহ্লাদিভাবে তার দিকে তাকান। কৃতজ্ঞতা আপনার চোখে ফুটিয়ে তুলুন। কিছু চাইতে হলে খুব সুন্দরভাবে বলবেন। চাপাচাপি করবেন না। অনেক দাবি একসাথে করে বসা কিংবা অনবরত একই জিনিসের জন্য জ্বালাতন করা একদমই অনুচিত।

<u>৩. মানসিক :</u> তিনি যেসব ভালো কাজ করেছেন, তার একটি তালিকা তৈরি করুন। মানুষ ভুল করতেই পারে। বলে বসতে পারে বোকার মতো কোনো কথা। কিন্তু সেটার জের ধরে স্বামীর ভালো কাজগুলো ভুলে যাবেন না যেন।

অথচ আমাদের স্বামীরা বছরের পর বছর ধরে যেসব ভুল করে, আমরা সেগুলোই মনে রাখি। মিসরীয় নারীরা এ ক্ষেত্রে এক কাঠি সরেস। তারা এটাকে বলে ব্ল্যাক লিস্ট। স্বামীর সাথে রেগে গেলেই স্ত্রী সেই ব্ল্যাক লিস্ট বের করে আনেন। অতীতের একের পর এক ভুল মনে করিয়ে দিয়ে নাজেহাল করে ফেলেন তাকে। এমনকি যদি স্বামী এই কাজটির জন্য অনেক আগে ক্ষমা চেয়েও থাকেন এবং স্ত্রী যদি তাকে ক্ষমা করেও থাকেন, তবুও। এই বিষয়টির কথাই বলা হয়েছে আমাদের আলোচ্য হাদীসটিতে।

এ রকমটা করবেন না। একটা কিছু ভুল হলেই সমস্ত ভালো কাজ ভুলে যাওয়ার বিষয়টা মানুষকে হতাশ করে তোলে। স্বামীর মনে হবে যে, আপনাকে খুশি করাটা বুঝি অসাধ্য কোনো কাজ।

আমার বিবাহিত জীবনের শুরুর দিকে এই হাদীসটি পড়েছিলাম। ভয় পাচ্ছিলাম আমিও এ রকম করে ফেলি কি না। তাই ল্যাপটপে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করলাম। "স্বামীর যেসব জিনিস আমি ভালোবাসি" এই শিরোনামে। তিনি আমার জন্য, আমাকে খুশি রাখার জন্য যত উত্তম প্রচেষ্টা করেছেন, যতবার তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন বা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছেন কিংবা আমাকে প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় উঠিয়েছেন, এই সবকিছুর তালিকা তৈরি করলাম সেখানে।

তারপর যখনই ঝগড়া হতো (দাম্পত্য-জীবনে এসব হয়। এটা কোনো ব্যাপার না) তখনই এই হোয়াইট লিস্টটাতে চোখ বুলিয়ে নিতাম নিজেকে শান্ত করার জন্য। দৃষ্টিভঙ্গিটাকে সঠিক পথে রাখতাম।

সুতরাং একটি হোয়াইট লিস্ট তৈরি করুন। সেই লম্বা ব্ল্যাক লিস্ট ছিঁড়ে ফেলুন, বোনেরা। আপনিও সুখী থাকবেন এবং আপনার স্বামীও, ইনশাআল্লাহ।

# গৃহিণী মায়ের জব ডেসক্রিপশান

-উম্মে খালিদ

কিছু আধুনিকা নারী কেন গৃহিণী হওয়াকে অবজ্ঞার চোখে দেখে? কারণ বাস্তবে এই কাজ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই।

একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য আপনাকে এতে পারদর্শী হতে হবে। থাকতে হবে কাজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও চর্চা। কখনো-বা শিক্ষানবিশ হিসেবে অভিজ্ঞতা। তারপরই আপনি সেই কাজের জন্য প্রস্তুত হবেন। যেকোনো পেশার জন্য তা সত্য। কিন্তু গৃহিণী মা হওয়ার শিক্ষা আমরা গ্রহণ করব কোথা থেকে?

একটি পরিবার সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে কী প্রয়োজন? ভালো গৃহ-ব্যবস্থাপনার সাথে কোন বিষয়গুলো জড়িত? সর্বাধিক উৎপাদনশীলতা এবং সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য কীভাবে দিনটিকে ব্যবহার করা উচিত?

দিনের বেশির ভাগ সময় বাইরে থাকে অনেকে। অনেক ছেলেমেয়ে খুব সকালে বাসা থেকে বের হয়ে ফেরে অনেক দেরিতে। তারা চলে যাওয়ার পর সারাদিন মা ঠিক কী করছিলেন, তা তারা দেখতে পায় না। তাই ধরেই নেয় যে, আসলে কিছুই করেন না তিনি। হয়তো সারাদিন বসে থাকেন বা ঘুমান। হয়তো বাড়ি নিজে নিজেই চলে। পরিবার নিজের যত্ন নিজেই নেয়।

আমরা যা জানি না, তার সম্মানও করি না।

নিউ জার্সির পাবলিক স্কুলে পড়াকালীন আমাদের একটি সেমিস্টারে গার্হস্থ্য অর্থনীতি ক্লাস ছিল। শিক্ষিকা আমাদের বেশ কয়েকটি বিষয় শেখালেন। বোতাম সেলাই করা, নানারকম রান্না, শার্ট ইস্ত্রি করা ইত্যাদি। তখন আমার বয়স প্রায় ১২ বা ১৩ বছর। কাজগুলো ছিল খুবই আনন্দদায়ক ও বাস্তবসম্মত।

আজকাল বেশির ভাগ আমেরিকান স্কুল পাঠ্যসূচি থেকে হোম ইকোনমিক্স বাদ দেওয়া হয়েছে। বাচ্চাদের লাইফ স্কিলস শেখানো হচ্ছে না। ঘরদোর সামলানো, রান্না,

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, গৃহ ব্যবস্থাপনা শেখাচ্ছে না কেউ আর। একেই তো বাসায় না থাকার ফলে মায়ের কাজকর্ম দেখি না, স্কুলে থেকেও শিখি না তার কিছুই।

ফেমিনিস্ট প্রোপাগান্ডায় তাই বিয়ে মানে দাসত্ব, স্বামীর সেবাযত্ন মানে আত্মমর্যাদাহীনতা, গৃহিণী মানে শুয়ে-বসে থাকা। এটা হলো সফল ও সুন্দরভাবে পরিবার পরিচালনার বিস্তারিত জ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ অজ্ঞতা। এতে পরিবার ও পরিবারে সবার জীবনে একজন মা, একজন স্ত্রীর ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করা হয়।

গৃহিণী মায়ের কাজ তাহলে কী?

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﵄ বর্ণনা করেছেন যে রাসূল ﷺ বলেছেন,

"তোমরা প্রত্যেকে হলে রাখাল। নিজেদের ভেড়ার পালের দায়িত্ব তোমাদের ওপর। শাসক শাসিত লোকদের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়বদ্ধ। নারী তার স্বামী ও সন্তানের ব্যাপারে দায়বদ্ধ।"[২৩]

গৃহিণীর ভূমিকার তিনটি প্রধান ক্ষেত্র হলো স্বামী, সন্তান ও সংসার। এই ভূমিকা পালনে প্রয়োজন দায়িত্বশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, অভিযোজ্যতা???, সৃজনশীলতা এবং শৃঙ্খলা। পরিবারের প্রতি ভালোবাসার বাইরেও অনেক দায়িত্ব পালন করেন গৃহিণী।

একটি সংসার চালানো সহজ কথা নয়। রান্না ও ঘরদোর পরিষ্কারের চেয়েও এটি অনেক বেশি কিছু। রান্না করা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আপনি ও আপনার পরিবার প্রতিদিন যে খাবার খাচ্ছেন, সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হচ্ছে না। প্রতিরাতে খাবার অর্ডার দেওয়া ব্যয়বহুল। তা ছাড়া এটি স্বাস্থ্যসম্মতও নয়।

নৃবিজ্ঞানীদের মতে, বেশির ভাগ মানুষ খাবারের মাধ্যমে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। মোটামুটি সব সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই এটা বাস্তব। ভালোবাসা দিয়ে তৈরি গরমাগরম ঘরের খাবারের স্মৃতি লোকে সযত্নে লালন করে।

একটি ঘর পরিচ্ছন্ন, সুসংহত ও পরিপাটি রাখা আসলে বেশ পরিশ্রমের কাজ। তা ছাড়া সবকিছুর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। বাড়ির প্রতিটি ঘরে জিনিসপত্র পরিপাটি করে ব্যবহারের উপযোগী করে রাখা আরেকটি কাজ। কাপড় ধুতে গেলে বেশ কয়েকটি ধাপে পরিষ্কার করতে হয়। কোনো কাজই আপনা-আপনি হয় না। রান্নার পরিকল্পনা, সদাইপাতি কেনাকাটাসহ সব কাজই সক্রিয়ভাবে করতে হয়। একজন

[২৩] সহিহ বুখারি : ২৫৫৪

গৃহিণী তার বাসাটাকে সুন্দর করে নানান রকম জিনিস দিয়ে সাজান। সংসারের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে দেন তার ভালোবাসার ছোঁয়া। সাধারণ একটি ঘরকেও আরামদায়ক করে তোলেন তারা।

এসব মৌলিক দায়িত্ব পালন করেও একজন নারী খুব সুন্দরভাবে সংসার সামাল দেন। তিনি মাল্টিটাস্কিং-এ পারদর্শী। এমন না যে তাকে একবারই কাপড় ধুতে হচ্ছে বা মাঝেমধ্যে বাজার করতে হচ্ছে বা মাঝেমধ্যে রান্না করতে হচ্ছে। এ কাজগুলো করতে হয় প্রতিনিয়ত। এর জন্যে প্রয়োজন সময়-ব্যবস্থাপনা এবং অভিজ্ঞতা। কোন জিনিসটা দৈনিক পরিষ্কার করতে হবে, কোনটা সপ্তাহে বা মাসে একবার, সে বিষয়ে একটি সময়সূচি থাকে তার। বাচ্চাদের পোশাক তাদের আকার এবং বছরের ঋতু অনুসারে গুছিয়ে রাখেন। এগুলো সুচারু গৃহ-ব্যবস্থাপনার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

পাশাপাশি পরিবারের প্রত্যেকের সময়সূচির মধ্যেও সমন্বয় করতে হয় গৃহিণীকেই। কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান একই দিনে পড়ে গেল কি না, বাচ্চাদের কোথাও নিতে হবে কি না, ইত্যাদি অনেক কিছুই।

গৃহিণী তার স্বামীর আশ্রয়স্থল ও অনুপ্রেরণা। তার প্রশান্তি ও আরাম-আয়েশের তদারককারী। এর মধ্যে আছে নারী হিসেবে তার সহজাত কর্মচাঞ্চল্য, অমায়িক আচরণ। আছে স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। স্বামীকে তার প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করেন তিনি। জানেন একটি সুখী দাম্পত্য-জীবনের জন্য আসলে কী প্রয়োজন, যা দুনিয়ার সীমানা ছাপিয়ে জান্নাতেও টিকে থাকবে।

স্ত্রী ও পরিবারের জন্য স্বামী যে কঠোর পরিশ্রম করেন এর জন্য স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। একটি সুখী দাম্পত্য-জীবনে তিনিও বিনিময়ে তার স্বামীর তরফ থেকে পান প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

বাচ্চাদের লালন-পালন ও তরবিয়াহ গৃহিণীর আরেকটি বিশাল দায়িত্ব। তাদের ইসলামী মূল্যবোধ শিক্ষাদান, চরিত্র গঠনে সহায়তা, নিঃশর্ত ভালবাসার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, বাচ্চাদের সাথে নিজেও বাচ্চা হয়ে যাওয়া, আদর, জড়িয়ে ধরা, হাসিঠাট্টা, খেলাধুলা, তাদের নিষ্পাপ চোখের কান্না মুছে দেওয়াসহ আরও কত কী!

তিনি শিশুদের সাথে কথা বলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে। তাদের পরিচয় করিয়ে দেন ইসলামের সৌন্দর্যের সাথে। শেখান দায়িত্বশীলতা, কঠোর পরিশ্রম এবং ন্যায়সংগত আচরণ। তিনি তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলেন, যা তাদের প্রয়োজনীয় আবেগীয়, শারীরিক ও মানসিক

বিকাশের জন্য প্রয়োজন। তিনি তাদের প্রথম শিক্ষক। লিখতে ও পড়তে শেখান। বাচ্চাদের হোমস্কুলিং করালে তো এসব কাজই রূপ নেয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষায়।

গৃহিণী মা পরিবারের ভিত্তি। তিনি তার গৃহের সুকূন, এর সৌন্দর্য, এর শক্তি। তিনি সেই মজবুত বাঁধন, যা সবকিছু এবং প্রত্যেককে একত্র করে রাখে।

হয়তো ভাবছেন এসব কাজ না জানা নারীদের নিন্দা করছি আমি। মোটেও এ রকম কিছু নয়। আমি শুধু দেখাতে চাইছি যে, গৃহ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা কতটা ক্রটিপূর্ণ।

অবশ্যই অনেক নারীর স্বেচ্ছায় বা পরিস্থিতির কারণে বিয়ে হয় না। কারও বিয়ে হয় তো সন্তান হয় না বা কোনো কারণে সন্তান নিতে চায় না। কেউ-বা কর্মজীবী স্ত্রী ও মা। যার ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন। হতে পারে তিনি বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা। হতে পারে স্বামী অসুস্থ। হতে পারে তাদের খরচ বেশি। কিছু নারী সংসার-সন্তান সামলেই পড়াশোনা করছেন। কেউ-বা আবার অনলাইনে কাজ করছেন বা উদ্যোক্তা বা গৃহভিত্তিক ব্যবসায়ী হিসেবে। এ সবকিছুই ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতা। কোনোটিকে তুচ্ছ করার কিছু নেই।

তবে কিছু বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন।

ডিগ্রি থাকতে হবে বলেই ডিগ্রি অর্জন করা আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত নয়।

ক্যারিয়ার থাকতে হবে বলেই ক্যারিয়ার গড়াও আদর্শ হওয়া উচিত নয়।

আমাদের কয়টা ডিগ্রি আছে বা কত টাকা আয় করি বা আমাদের প্রফেশনাল টাইটেল কয়টা আছে, এগুলোর ওপর নারী হিসেবে আমাদের মর্যাদা নির্ভর করে না।

স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকা বুঝতে না পারা কারও জন্যেই ভালো নয়। গৃহিণীকে দাসী হিসেবে দেখা কেবলই মূর্খতা। তাকে অকর্মণ্য, অনুৎপাদনশীল নারী হিসেবে দেখা, যে কিনা তার স্বামীকে ব্যবহার করে, গালগল্প করে বেড়ায় এবং নাটক-সিনেমা দেখে দিন কাটায়—এটা ভাবাও নির্বুদ্ধিতা।

গৃহিণীত্ব দাসত্ব নয়। নয় কোনো অর্থহীন, নির্বোধ পরিশ্রম। এটি সংসার ও সম্পর্ককে সাজানোর এক মহাকর্মযজ্ঞ।

# রমণীর গুণ

-উম্মে খালিদ

আমি আমার স্বামীর জন্য কফি বানাই। খাবার রান্না করি। তার কাপড় ধুয়ে দিই। বাসায় থেকে সন্তানদের লালন-পালন করি। সংসার পরিচালনা করি। স্বামী-সন্তানের যত্ন নিই।

ভালোবেসেই করি আমি এসব। স্বামী-সন্তানদের সেবা করতে ভালোবাসি আমি। তাদের আনন্দিত ও তৃপ্ত দেখলে নিজে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হই।

ওদিকে স্বামী করেন তার কাজ। আমার পুরো আর্থিক ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করেন। আমাকে নিরাপত্তা দেন, যত্ন নেন। দেন সঙ্গ ও ভালোবাসা। বাচ্চাদের জন্য তিনি রোল মডেল। আমাদের পরিবারের কর্তা। আমরা সানন্দে তার আনুগত্য করি।

মাঝেমধ্যে আমি ক্লান্তিবোধ করি। হয়তো রাতে ভালো ঘুম হয়নি। তখন নিজের অনেক কাজই করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন তিনি। আমাকে জিজ্ঞেস না করেই আমার কাজগুলো নিজের কাঁধে নিয়ে নেন।

আমি নারীবাদী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী নই, যেখানে বিয়ে মানে একইরকম দুটো মানুষের মাঝে ব্যবসার মতো মাপামাপা, কাঠখোট্টা সমান হিসাব। আমি বিশ্বাস করি ইসলামে। এখানে বিবাহ একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক। প্রত্যেকে প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন এবং তাদের ভূমিকাও আলাদা। আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষেত্র, নিজস্ব অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এই ব্যবস্থা নিয়ে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট।

সন্তুষ্ট হবই-বা না কেন? আমাকে তো কোনো বিল পরিশোধ করতে হয় না। চিন্তাই করতে হয় না এসব নিয়ে। রমজানে বা অন্য কোনো সময় গরমের মধ্যে ঘরের বাইরে কাজ করতে হয় না। এই কাজগুলো আমার জন্য কঠিন। বোঝাস্বরূপ।

পক্ষান্তরে আমার নিজের কাজগুলো সহজাতভাবেই আসে, আলহামদুলিল্লাহ। এতেও

যে কষ্ট-ক্লান্তি নেই, তা না। সব কাজেই কষ্ট আছে। আমারও, স্বামীরও।

আল্লাহ আমাদের আলাদা স্বভাব সহকারে সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন স্বতন্ত্র ভূমিকা। সে ভূমিকা পালনের জন্য দিয়েছেন প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

ভূমিকাগুলো স্পষ্টরূপে সংজ্ঞায়িত করা না হলে দেখা দেয় অস্পষ্টতা। তখন সমস্যা শুরু হয়। একজন আরেকজনের দিকে কড়া দৃষ্টি রাখে যে, সবাই ঠিক সমান সমান কাজ করছে কি না। দেখা দেয় উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা ও শেষ পর্যন্ত দুর্দশা।

উম্মে ইয়্যাসের বিয়ে হচ্ছে। স্বামীর ঘরে চলে যাবেন খানিক পর। তার মা উমামাহ বিনতে আল-হারিস আশ-শায়বানী তার কন্যাকে সে সময় দেন মূল্যবান কিছু পরামর্শ। আল্লামা আল-আলূসি তার বুলুগুল আরব (২/১৯) গ্রন্থে তুলে এনেছেন সেগুলো :

"হে আমার মেয়ে, উঁচু বংশের সম্ভ্রান্ত মেয়ে হিসেবে এসব গুণাবলি এমনিতেও তোমার মাঝে রয়েছে। তবুও এই উপদেশমালাকে অপ্রয়োজনীয় ভেব না। কথাগুলো উদাসীনদের জন্য সতর্কবার্তা এবং বুদ্ধিমানদের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

হে আমার মেয়ে, কোনো নারী ধনী হলেই যদি স্বামীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত, তাহলে স্বামী ব্যতীত জীবন কাটাতে তুমিই সর্বাধিক সক্ষম হতে। কিন্তু নারীদের যেমন পুরুষদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনই পুরুষদেরও নারীদের জন্য।

হে আমার মেয়ে, তুমি যে গৃহে বড় হয়েছ, যেখানে প্রথম হাঁটা শিখেছ, সেখান থেকে চলে যাচ্ছ এক অচেনা জায়গায়। এক অচেনা সঙ্গীর সাথে। কর্তৃত্ব ও অধিকারবলেই তিনি তোমার তত্ত্বাবধায়ক ও কর্তা।

সুতরাং তুমি তার দাসী হয়ে যাও। তিনি স্বেচ্ছায় তোমার দাস হয়ে যাবেন।

আমার প্রিয় মেয়ে, আমার কাছ থেকে দশটি গুণের কথা শুনে রাখো। এগুলো তোমার জন্য একেকটা সম্পদ এবং স্মরণিকা।

তার সাথে সন্তুষ্ট থাকবে। তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। সন্তুষ্টি মনে বয়ে আনে শান্তি। আর স্বামীকে মান্য করা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে।

তার চোখ ও নাকের সুরক্ষা দিয়ো। যাতে তার চোখ কখনো তোমার মাঝে কুৎসিত কিছু দেখতে না পায়। আর তার নাক কখনো যেন তোমার থেকে না পায় কোনো দুর্গন্ধ। তবে এর জন্য ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সৌন্দর্যের জন্য সামান্য কাজলই যথেষ্ট।

আর পানি দিয়ে পরিচ্ছন্নতা অর্জন বিরল সুগন্ধি মাখার চেয়েও ভালো।

তার খাবারের সময়ের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। তার ঘুমের সময়টাকে রাখবে নিরিবিলি। ক্ষুধার জ্বালা ক্রোধ তৈরি করে। আর ঘুম থেকে বঞ্চিত হওয়া বিরক্তিকর।

তার গৃহের এবং তার সম্পদের সুরক্ষা করবে। তার নিজের, আত্মীয়দের ও সন্তানদের যত্ন নিয়ো। তার সম্পদ রক্ষা করা সুবিচারের লক্ষণ। তার সন্তান, গোলাম এবং আত্মীয়-স্বজনদের যত্ন নেওয়া সুব্যবস্থাপনার পরিচায়ক।

তার গোপন কথা ফাঁস করে দেবে না। না হলে তার কাছ থেকেও আসতে পারে পালটা বিশ্বাসঘাতকতা। কখনো তার আদেশ অমান্য কোরো না। না হলে তোমার প্রতি ঘৃণায় ভরে যাবে তার অন্তর।

তার দুঃখে হেসো না। তার সুখে গোমড়ামুখো হয়ে থেকো না। প্রথমটি দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, দ্বিতীয়টি শত্রুতাপূর্ণ আচরণ।

তাকে যত সম্মান করবে, ততই তিনি তোমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন। তার কথা যত শুনবে, তিনি তোমার সাহচর্য ও কথাবার্তা উপভোগ করবেন তত বেশি।"[২৪]

আজকালকার কিছু মুসলিমের কাছে উমামাহ এবং তার কন্যা উম্মে ইয়্যাস দুর্বল আত্মমর্যাদাহীন নারী হিসেবে উপহাসের পাত্র। পুরুষতন্ত্র যাদের মগজধোলাই করে দিয়েছে। যারা মিথ্যে সান্ত্বনায় ডুবে আছেন।

"স্বামীর 'দাসী' হবো?! কখনোই না। আমি শক্তিশালী, স্বাধীন, ক্ষমতাশালী নারী। একাই করতে পারি সব।"

---

[২৪] বুলুগুল আরাব : ২/১৯। মূল বর্ণনা রয়েছে: আবুল ফযল মায়দানী; মজমাউল আমছাল : ২/২৬২ [৩৭৫৯]

তবে এই নারীবাদীরা যেটা ভুলে গেছে, তা হলো এই সমীকরণের দ্বিতীয় অংশ,

“তিনি স্বেচ্ছায় তোমার দাস হয়ে যাবেন।”

কারণ, উত্তম আচরণের স্বাভাবিক প্রতিদান অনুরূপ সদাচরণ।

আল্লাহ আল-কুরআনে বলেছেন,

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ

**“দুশ্চরিত্রা নারীরা দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দুশ্চরিত্র পুরুষরা দুশ্চরিত্রা নারীদের জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য।”[২৫]**

[২৫] সূরা আন নূর : ২৬

# শাপে বর

-উম্মে খালিদ

এই ছুটিতে নতুন এক বান্ধবীর সাথে পরিচয় হলো। তার জীবনের গল্প হৃদয়ে বেশ নাড়া দিয়েছে।

শুরুর দিকে তার জীবন ছিল বড্ড সহজ এবং আদুরে। তার কথায়, পরিবারের ছোট মেয়ে হওয়ায় বেশি আদরে বিগড়ে গিয়েছিল সে। সে কখনোই রান্নাবান্না বা ঘরদোর পরিষ্কার করা শেখেনি। ছোটবেলা থেকে কৈশোরকালে এমনকি তরুণ বয়সেও তেমন কাজকর্ম করতে হয়নি তাকে। সে গান শুনতে পছন্দ করত। সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পরে লেবাননে তার নিজ শহরে চক্কর কাটত বন্ধুদের সাথে।

তারপর তার জীবনে স্বামী হয়ে আসে এক সুদর্শন পুরুষ। মানুষটা তাকে ভালোবেসে আগলে রেখেছিল। মেয়েটা আমাকে বলছিল, তার বিয়ে হয় বেশ জমকালো আয়োজন সহকারে। আমি তার কথা অবশ্যই বিশ্বাস করি। কারণ, লেবানিজরা জানে কীভাবে পার্টি করতে হয়।

তারপর এক নিমেষে তার জীবনটা বদলাতে শুরু করে।

রাজকীয় বিয়ের এক সপ্তাহ পর নববিবাহিত যুগল গেল হানিমুনে। ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে স্বামী-স্ত্রী একটি ক্যাফেতে গিয়েছিল।

যে হাস্যোজ্জ্বল স্বামীর দিকে সে একটু আগেও ভালোবাসা নিয়ে তাকিয়ে ছিল, সেই স্বামীই কিছুক্ষণ পর হার্ট অ্যাটাক হয়ে শুয়ে ছিল ক্যাফের ফ্লোরে।

তার স্বামী হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। উনার বয়স ছিল ৪০। মেয়েটার বয়স তখন ২৫। নতুন বউ হওয়া মেয়েটি হুট করে বিধবা হয়ে গেল।

মানসিকভাবে মেয়েটি একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কয়েক বছরের মধ্যে নতুন কোনো সম্পর্কে জড়ানোর কথা ভাবতে চায়নি সে। লেবাননে থাকাটাই তার জন্য

অসহনীয় হয়ে ওঠে। নিজের অতীত, স্বদেশ সবকিছু ছেড়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য পাড়ি দিল কানাডায়।

তিন-চার বছর পর মেয়েটা একটু স্বাভাবিক হতে শুরু করে। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু তাকে আর পীড়া দেয় না ঠিকই, কিন্তু নতুন করে বিয়ের ব্যাপারে আর ভাবতে মন চায়নি তার। সে তখনো ট্রমাটাইজড।

কানাডায় থাকতেই তার মা অসুস্থ হয়ে মারা যান।

কানাডাতেই তার দেখা হয় এক লেবানিজ ব্যক্তির সাথে। ভদ্রলোকের স্ত্রীর সাথে ডিভোর্স হয়ে গেছে। সাত বছরের একটা মেয়ে আছে তার। লোকটার স্বার্থপর স্ত্রী তাকে ও মেয়েটাকে অবহেলা করে ছেড়ে চলে গেছে।

জীবনে আবারও কোনো নারীকে বিশ্বাস করবে কি না এই নিয়ে মানুষটা ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। তার মেয়েটাকে যদি আবার কষ্ট পেতে হয়? মেয়েটার নিজের মা-ই যেখানে তাকে কষ্ট দিয়েছে।

কিন্তু এই সাত বছরের মেয়েটার কারণেই আমার লেবানিজ বান্ধবী আর এই ভদ্রলোকের বিয়ে হয়। বেশ কিছু অনুষ্ঠানে আমার বান্ধবীর সাথে দেখা হয় মেয়েটার। একদিন ছোট্ট মেয়েটা আমার বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করে, “আপনি আমার মা হবেন? বিয়ে করবেন আমার বাবাকে? আমি এবং বাবা দুজনই আপনাকে পছন্দ করি।”

এদিকে আমার বান্ধবী শপথ নিয়ে বসে আছে সে বিয়ে করবে না। বিয়ে করলে আবারও খারাপ কিছু ঘটবে, এই ভয় ছিল তার।

কিন্তু কয়েক মাস পর ঠিকই তার বিয়ে হয়। তার সাবেক স্বামীর মৃত্যুর ঠিক চার বছর পর। এখন মেয়েটার জীবনে আছে বেচারা গোছের যত্নবান স্বামী আর আছে ভারী মিষ্টি ছোট্ট একটা সৎমেয়ে।

বান্ধবীর মনে আশার আলো জ্বলতে শুরু করে।

এই যুগলের বিয়ের এক সপ্তাহ পরই আমার বান্ধবীর ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়ে।

পরবর্তী এক বা দুই বছর কাটে হাসপাতালে। ডাবল মাস্টেক্টমি এবং যন্ত্রণাদায়ক কেমোথেরাপির মধ্য দিয়ে যেতে হয় তাকে। তার মাথার সুন্দর লম্বা চুলগুলো পড়ে যায়, ওজন হ্রাস পায়।

অসুস্থতার এই সময়টায় তার বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া হয় নানারকম। কেউ স্মোকিং শুরু করে দেয়। কেউ-বা হিজাব পরাই বাদ দিয়ে দেয়। তারা মেয়েটার জীবনে তাকদিরের ফায়সালা মেনে নিতে পারছিল না একদম। তাদের মতোই হাসিখুশি একটি মেয়ে। কেন তার সহজ জীবনটায় হুট করে দুর্ভাগ্যজনক মোড় নিতে হবে? স্বামীর মৃত্যু, বিষণ্নতা, মায়ের মৃত্যু, আর এখন এই ক্যান্সার!

তার বন্ধুরা বলত, জীবনটা তার সাথে বড্ড অন্যায় করেছে। তারা এসব সইতে পারছে না।

কিন্তু সুবহানাল্লাহ! এই নারীর ঈমান এখন আগের চেয়েও অনেক অনেক বেশি মজবুত। ক্যান্সার, কেমো, রেডিয়েশন, এত বড় বড় অপারেশন তাকে নিয়ে গেছে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু সে আল্লাহকে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করেছে।

প্রগাঢ়চিত্তে, আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করে গেছে সে। হাসপাতালে তীব্র যন্ত্রণার সময় নিজেকে যিকিরে ব্যস্ত রেখেছে। যখনই সম্ভব হতো, তখনই সালাত আদায় করত।

অবশেষে আল্লাহর রহমতে ক্যান্সার সেরে ওঠে। হসপিটাল থেকে ফিরে আসে মেয়েটা। এবার সে একেবারেই ভিন্ন একটা মানুষ। তার এই ত্রিশ বছরের মতো জীবনে এই প্রথম সে হিজাব পরতে শুরু করে। কুরআন তিলাওয়াত ও দুআতেই নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখে সে। মৃত্যুর একেবারে কাছে গিয়ে এই যে তার ফিরে আসা, এই ফিরে আসাই তাকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের শিক্ষা দেয়। সে বুঝতে পারে জীবনের প্রকৃত কদর কীভাবে করতে হয়।

একদিন আমাকে বলছিল, "এই ক্যান্সার থেকে অনেক কিছু শিখলাম। জীবনে যত পরীক্ষাই আসে, তা আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেয়। আমার অসুস্থতা তো একা আমার একার জন্যে পরীক্ষা ছিল না। আমার আশপাশের সবার জন্যেই পরীক্ষা ছিল এটা। যেমন : আমার নতুন স্বামীর জন্যে। মানুষটা ভেবেছিল এবার বোধহয় সন্তানকে বড় করার যুদ্ধে এক সঙ্গিনী জুটল। উল্টো তারই আমাকে সাহায্য করতে হয়েছে। এই পরীক্ষা ছিল আমার বন্ধুদের জন্য। ওদের ঈমান ছিল দুর্বল। এই পরীক্ষা তাদের বুঝিয়েছে দুনিয়াটা ক্ষণস্থায়ী। মৃত্যুকে তারা দেখতে পেয়েছে একেবারে কাছ থেকে। এই ঘটনায় তারা আল্লাহর দিকে ফিরতে পারত। কিন্তু একেকজনের একেক চয়েস। উল্টো তারা এই দুনিয়ার মোহে আরও আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, ডুব দিয়েছে খামখেয়ালিপনায়।

আমাদের হাতে আসলে বেশি সময় নেই। যেকোনো মুহূর্তে জীবনটা বদলে যেতে

পারে। তাই প্রতিটা নিঃশ্বাস ব্যবহার করতে হবে আল্লাহর স্মরণে। দুনিয়ায় কিছুই টিকে থাকবে না। কিন্তু আল্লাহর জন্য করা কাজগুলো থাকবে অনন্তকাল। আমাদের সঠিক পথে মনোযোগ দিতে হবে। বেশির ভাগ মানুষই ভুলের মধ্যে বাস করছে। যেমনটা আমি ছিলাম, জীবনের দীর্ঘ একটা সময়। যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি, তখনই সংবিৎ ফিরে পেয়েছি। আল্লাহর কাছে দুআ করি, কখনো যাতে তিনি এই বান্দিকে তা ভুলতে না দেন।"

তার কথা শুনে সূরা আলে ইমরানের এই আয়াতের কথা মনে পড়ল,

"আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।"[২৬]

---

[২৬] সূরা আলে ইমরান : ১৭২

# মনের কথা খুইলা কইব???

-উম্মে খালিদ

## বোনদের জন্য :

আপনার স্বামী জাদুকর বা মাইন্ডরিডার নন। আপনার মনের কথা পড়তে পারেন না তিনি। এমনটা আশা করবেন না যে, জাদু দিয়ে তিনি আপনার রেগে থাকার কারণ বুঝে ফেলবেন। কিংবা সেটা সমাধানের উপায়।

তার কোনো কথা বা কাজ হয়তো আপনাকে কষ্ট দিয়েছে। সেটা তাকে সরাসরি বলুন। আপনি না বলা পর্যন্ত তিনি জানতে পারবেন না। হয়তো ওই কথা বা কাজটা আপনার কাছে অপমানজনক বা নিষ্ঠুর মনে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু ওটা স্রেফ আপনার মনের ভাবনা। তার উদ্দেশ্য তেমনটি ছিল না।

হয়তো চাইছেন যা হয়েছে, সেটা তিনি নিজে থেকে অনুধাবন করুন, এসে ক্ষমা চেয়ে নিন। কিন্তু তিনি তা না করায় আরও রেগে যাচ্ছেন আপনি। মনের ভেতর পুষে রাখছেন কষ্ট আর অস্বস্তি। নিঃশব্দে ক্রোধে ফেটে পড়ছেন। ভাবছেন, তার এত্ত বড় স্পর্ধা! নিজে থেকে এসে ক্ষমা চাইছে না!

স্বামীর সাথে সুস্থ-সুন্দর সম্পর্কের জন্য আপনাকে নিজের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। তিনি সব সময় নিজের ভুল বুঝতে পারবেন, এটা আশা করবেন না। নিজে তার সাথে গিয়ে কথা বলুন। জানান আপনার মনের অবস্থা।

কথা বলতে গিয়ে তাকে তাচ্ছিল্য দেখাবেন না। আক্রমণাত্মক না হয়েই সৎ ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলা সম্ভব। পুরুষরা তাচ্ছিল্য খুব অপছন্দ করে। তাদের কাছে এটা অসম্মানজনক। তখন উত্তেজিত হয়ে যান তারা। রক্ষণাত্মক হয়ে ওঠেন। আক্রমণ করলে এমনটা হওয়াই তো স্বাভাবিক, তাই না?

তাই এভাবে কথা শুরু করুন, "আপনার অমুক কাজটায় খুব কষ্ট পেয়েছি" বা "ওই কথাটা বলা কি ঠিক হয়েছে?"

আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে "এই কথাটা বলেছিলেন কেন?" "ওই কাজটা কেন করলেন?" এ রকম কাটাকাটা কথা বলবেন না।

মনে রাখবেন বোনেরা, পুরুষরা নিজেকে সম্মানিত ভাবতে পছন্দ করেন।

## ভাইদের জন্য :

আপনার স্ত্রী তার নিজের আবেগ-অনুভূতি আপনার সামনে প্রকাশ করার সময় খুব নাজুক থাকেন। তিনি তার সত্যিকারের আবেগ, তার প্রয়োজনের কথা আপনার কাছে প্রকাশ করার সাহসিকতা দেখিয়েছেন। তিনি আপনার সাথে সৎ থাকার চেষ্টা করছেন। চেষ্টা করছেন সমস্যা মিটমাট করার। এটাকে মূল্য দিন।

দুর্বলতা ও প্রয়োজনের এই মুহূর্তে যদি তাকে বিদ্রুপ করেন, তাহলে বিভেদ আরও বাড়বে। একে তো করেছেন আঘাত, এবার তাতে যুক্ত করলেন অপমান।

তার কথাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করুন। যথাসাধ্য সমাধান করার চেষ্টা করুন তার উদ্বেগগুলো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এটা সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। একটু ব্যাখ্যা করতে দিলেই সহজে সমাধান হয়ে যায়। কেউ আঘাতও পাবে না এতে। স্রেফ আপনার অবস্থান থেকে তাকে ঘটনাগুলো দেখতে দিন।

কিন্তু কখনো বিষয়টা হতে পারে সত্যিই গুরুতর এবং আপনার দোষ। তাহলে সরাসরি ক্ষমা চাইবেন। নারীরা আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনাকে দাম দিতে জানেন। সহজেই মন থেকে সরিয়ে দেন ঘটনাটি।

যদি মনে হয় স্ত্রী ছোট্ট বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করছেন, তাহলে মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করুন। তার কাছে হয়তো-বা বিষয়টা বেশ বড়। তাই উড়িয়ে দেবেন না সেটা। অর্থহীন ঠাওরাবেন না তার উদ্বেগকে। এতে তিনি বঞ্চিত বোধ করবেন। আপনাকে দয়া-মায়াহীন বলে মনে হবে তার। কথা বলার আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি আরও দূরে সরে যাবেন আপনার থেকে।

নারীরা তাদের আবেগকে তুচ্ছ বা অগ্রাহ্য হতে দেখাকে ঘৃণা করেন।

যদি তিনি প্রকাশ্যে নিজের অনুভূতি আপনাকে জানান, যদি নিঃশব্দে মুখ গোমড়া করে বসে না থাকেন, কোনো রহস্যজনক চাহনি যদি না দেন, তাহলে সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন তার শর্ত মেনে নেয়ার। তার আবেগ-অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল হোন। সাড়া দিন তার প্রয়োজনের প্রতি।

তার জন্য ভালোবাসা প্রকাশ করুন চোখের ভাষায়, মৃদু স্পর্শে এবং একটি স্বস্তিদায়ক আলিঙ্গনের মাধ্যমে।

মনে রাখবেন ভাইয়েরা, নারীরা চায় ভালোবাসা।

## উভয়ের জন্য :

পুরুষ ও নারী নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে খুব ভিন্নভাবে কাজ করে। তাদের প্রয়োজন ভিন্ন। সুতরাং অনিবার্য সংঘর্ষ এড়াতে নিজেদের মাঝে কথা বলা প্রয়োজন। প্রয়োজন সুস্পষ্ট ও কার্যকর যোগাযোগ। নাহলে সব ভেঙে পড়বে।

আল্লাহ মানুষকে স্পষ্ট কথা বলতে শিখিয়েছেন। সূরা আর-রাহমানের এই আয়াতের শুরুতে আল্লাহ বলেছেন,

"করুণাময় আল্লাহ। শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা।"

ইনশাআল্লাহ এ ধরনের সরাসরি, সৎ ও আবেগঘন যোগাযোগের মাধ্যমে আপনার দাম্পত্য-জীবন হবে মসৃণ, সুখী ও নাটুকেপনা থেকে মুক্ত।

# কাছের মানুষ দূরে থুইয়া???

-গুল আফশান

ধরুন কেউ আপনাকে কিছু সময়ের জন্য একটি আহত বিড়ালছানা দিয়ে গেল। তাহলে আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই হবে এটির যত্ন নেওয়া। তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে আরও বেশি আদর করবেন। এটাই স্বাভাবিক।

অথবা ছাদে দেখতে পেলেন একটি পরিত্যক্ত পাখির বাসা। ছোট্ট মৃতপ্রায় একটি ছানা শুয়ে আছে তাতে। আপনি তাকে মরতে দেবেন না নিশ্চয়ই। তার যত্ন নেবেন, তাকে পশুচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবেন, খাওয়ানোর জন্য পাইপ ও সিরিঞ্জ কিনবেন। তার মলমূত্র সাফ করবেন। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি যত্ন নেবেন তার। এটাই করুণা।

কিংবা রাস্তায় পড়ে যেতে দেখলেন কোনো বৃদ্ধকে। নিশ্চয়ই তার সহায়তায় ছুটে যাবেন। জিনিসপত্র উঠিয়ে দেবেন, কাপড় ঝেড়েটেড়ে দেবেন। যদি তাদের হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হয়, তবে সানন্দে পার করে দেবেন বাকি পথটা। এটা মানবতা।

কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কে সঙ্গীর কোনো ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা দেখতে পেলে যেন কেয়ামত হয়ে যায়! যত্ন-ভালোবাসা তো দূরের জিনিস। এগুলো মানতেই পারেন না আপনি।

এই যুগে আমাদের মানসিকতা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, আমরা মানুষের চেয়ে প্রাণীদের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল। বিশেষ করে যদি সেই মানুষটি হয় আমাদের জীবনসঙ্গী।

আমরা নিজেকে বদলে যাওয়া দুনিয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে শেখাই, যদিও দুনিয়া এক নির্মম ও অকৃতজ্ঞ স্থান।। নিজেকে প্রশিক্ষণ দিই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাজ করতে। আর এখন তো মুখে মাস্ক, হাতে গ্লাভস, স্যানিটাইজার কতকিছু সহ্য করে নিচ্ছি। অথচ স্বামী বা স্ত্রীর স্বার্থে একটু মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হলেই ভাবেন যেন কী-না-কী ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

এসব কিছু ঘটছে কারণ অবচেতনভাবে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে চিন্তাভাবনা ও আচরণ

করতে শুরু করেছি আমরা। কিছু মানুষের রুটি-রুজি এর ওপর নির্ভরশীল। নাটক-সিনেমা-সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের এই চিন্তাপদ্ধতি শিখিয়ে দেয় তারা। আর বাস্তব জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ।

নারীবিরোধী কিছু পুরুষ আন্দোলন আছে। MGTOW, MRA-ism ইত্যাদি। এগুলোর বিষ এখনো মুসলিম সমাজে আসেনি। দুআ করি যেন কক্ষনো না আসে। তবে নারীবাদের বিষ ঢুকে গেছে ঠিকই। আর এগুলো প্রচার করা হচ্ছে আমাদের মসজিদের মিম্বার থেকে, শ্রেণিকক্ষের মঞ্চ থেকে। প্ল্যাকার্ডধারী কোনো স্বল্পবসনা নয়, এসব বিষ ছড়াচ্ছে হাতে কুরআনের কপিসহ কোনো হিজাবি।

পচন এখন স্পষ্ট। পশ্চিমা ধারণার অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। পুরোদমে কাজ করছে প্রোপাগান্ডার যন্ত্রপাতি। কিন্তু আমরা টের পাচ্ছি না। কারণ, অমুসলিমরা যেভাবে এসবে ডুব দিয়েছে, সেভাবে আমরাও ডুব দিয়েছি অবচেতনে।

যেখানে যুক্তি দাঁড় করানো উচিত, সেখানে ব্যবহার করছি আবেগ। ভেড়ার পালের সাথে ছুটে চলেছি, অথচ উচিত ছিল বুদ্ধি-বিবেচনার ব্যবহার।

ধরুন, আপনার ভাই বা বোন মানুষ হিসেবে খারাপ। আপনি তার জন্য পাত্রী বা পাত্রের সন্ধান করছেন। তাহলে তো এমন কোনো মেয়ে বা ছেলে খুঁজবেন, যে মানিয়ে নিতে জানে। ত্রুটি সত্ত্বেও তাকে ভালোবাসবে। সময় নিয়ে ধীরে ধীরে তাকে সংশোধন করবে, তাই না?

এবার এখানে নিজেকে বসান। স্বামীর মাঝে কোনো ত্রুটি পেলে অথবা স্ত্রী প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হলে আপনার কী করা উচিত? সে কেন নিখুঁত হলো না, এই নিয়ে হা-হুতাশ করবেন? নাকি নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন এই বিষয়গুলো সংশোধনে নিজের করণীয় সম্পর্কে?

একটু ভালোবাসা, একটু বোঝাপড়া এবং একটু যোগাযোগ অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে পারে। বিশ্বাস করুন বা না করুন, এগুলো জাদুকরী ওষুধ। আমাদের বাবা-মা এবং দাদা-দাদিদের প্রজন্মের বিয়ে সময়ের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছে। কারণ, তারা প্রথম সমস্যাটা পাওয়ামাত্রই একে অপরকে ছেড়ে দেননি। ধৈর্য ধরে একসাথে মোকাবিলা করতেন এগুলো।

সিনেমার মতো সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে না, তা ঠিক। উত্থান-পতন আসবে। কিন্তু এটাই তো জীবন। জীবন তো ভিডিও গেইম না যে, সমস্যায় পড়ার সাথে সাথে

রিস্টার্ট বাটন চাপবেন। আল্লাহর দোহাই লাগে, কিছুটা বাস্তববাদী হোন। সাহসী হোন একটুখানি।

বিয়ের প্রস্তুতি নিতে গিয়ে যার তার কথা শুনবেন না। সোশ্যাল মিডিয়া শাইখ, উস্তাদ, 'মাশাআল্লাহ ব্রাদার্স' এবং সেল্ফহেল্প গুরুদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা উচিত। দেখুন যে, তারা আপনাকে জীবনযুদ্ধের প্রস্তুতি শেখাচ্ছে, নাকি নিরেট যুদ্ধের। মনে রাখবেন, আপনার স্বামী আপনার প্রতিপক্ষ নয়, মিত্র। স্ত্রী আপনার প্রতিযোগী নয়, সঙ্গী।

দৃষ্টিভঙ্গির এই সংশোধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেবল স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে নয়; বরং পিতা-মাতা হিসেবে, আত্মীয় হিসেবে, সমাজের সদস্য হিসেবে এবং বৃহত্তর পরিসরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে আপনার সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ধারণ করবে আপনার চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি।

# কলহে করণীয়

-শাইখ ইউনূস কাথরাদা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ-বিবাদ দেখা দিলে আমাদের উচিত তা মিটমাট করে দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

মনোমালিন্যের কারণে অনেক দাম্পত্যই পৌঁছে যাচ্ছে ডিভোর্সের দ্বারপ্রান্তে। প্রায় প্রতিদিনই শুনি কিংবা নিজের চোখেও দেখতে পাচ্ছি এমন ঘটনা।

এ ক্ষেত্রে প্রায় সবাই একটি সাধারণ ভুল করে থাকেন। নিজেদের সংসারের বিভিন্ন সমস্যা মানুষজনকে বলে বেড়ান। অনেকে তো সোশ্যাল মিডিয়াতেও পোস্ট দিয়ে বসে। আর তা দেখে নিজেদের মতো করে দেদারসে মতামত জানাতে থাকে চেনা-অচেনা মানুষেরা।

মনে রাখবেন, কথা ছড়ায় দাবানলের মতো দ্রুত। এভাবে সেই দম্পতি নিজের অজান্তেই হয়ে যান 'টক অব দ্য টাউন'। এমন অনেক মানুষ আছে, যারা অন্যের কষ্ট দেখলে শান্তি পায়। এটা মোটামুটি সবাই জানি আমরা। আর আজকাল বিশ্বাসযোগ্য মানুষ খুবই কম। বলতে বাধ্য হলাম।

যাদের দাম্পত্য-জীবনে সমস্যা চলছে, তাদের প্রতি আমার উপদেশ থাকবে নিজের সার্কেল যথাসম্ভব ছোট রাখুন। কারও সহায়তা নিতে নিষেধ করছি না। সুপরামর্শ দিতে সক্ষম, এ রকম বিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থ অবশ্যই হবেন। কিন্তু আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড বা বেস্টিদের সার্কেল যে সেই বিজ্ঞ ব্যক্তি হবে—এমন কোনো কথা নেই। এমনকি আপনার বাবা-মাও সেই সঠিক ব্যক্তি না হতে পারেন।

দাম্পত্য সমস্যায় কিছু বিষয় মাথায় রাখবেন :

- জগতে বেশির ভাগ সমস্যারই সমাধান রয়েছে।
- সমাধান নিজে থেকে এসে ধরা দেবে না। সেটা খুঁজে বের করতে হবে আপনাকেই।

• নিজেদের সমস্যা যথাসম্ভব নিজেদের কাছেই রাখুন। যাকে-তাকে বলতে যাবেন না। যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনাকে সুপরামর্শ দেবে, তাদেরই বলুন শুধু। যত যা-ই হোক, আপনার পক্ষেই কথা বলবে—এমন বন্ধুর কোনো প্রয়োজন নেই।

• আল্লাহকে স্মরণ করুন, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করুন। এরপর পরামর্শসভা, সমঝোতাসহ যা কিছু প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা নিন। আমাদের অন্তরের নিয়ন্ত্রণ তো আল্লাহরই হাতে। তাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে সমীকরণ মেলাতে চাওয়া বোকামি।

• কলহ মিটিয়ে এক হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আন্তরিকতা বজায় রাখুন।

• অবশ্যই প্রত্যেকটা বিষয়ে সত্য বলবেন পরামর্শদাতার কাছে।

• নিজের কোনো ত্রুটি থাকলে তা অস্বীকার করবেন না। চেষ্টা করবেন নিজেকে সংশোধন করার। দোষ স্বীকার না করলে কোনো উপায়ই কাজে আসবে না।

• আলিম বা পরামর্শদাতার সাথে একবার দেখা করাই অনেক সময় যথেষ্ট হয় না। প্রায়ই প্রয়োজন পড়ে একাধিক বৈঠকের।

• মানুষমাত্রই ভুল। দেখা যায়, সঙ্গীর হাজারটা ভুল পেলেও নিজের ভুল নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। এ রকম সংকীর্ণ মানসিকতার হলে চলবে না।

• আশাবাদী এবং ইতিবাচক মানসিকতা রাখবেন। হতাশ হবেন না। নেতিবাচকতা পরিহার করুন।

• কষ্ট পেলে আমরা অনেক সময় বাড়াবাড়ি করে ফেলি। তাই শান্তভাবে পরিস্থিতিকে বাস্তবতার আলোকে বিচার করুন।

• কাউকে সহসাই পরিত্যাগ করবেন না। জেনে রাখবেন, মানুষ বেঁচে থাকলে বদলায়। ভুল করার পর পুনরায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসা একেবারেই স্বাভাবিক।

• বৈবাহিক বিষয়ে সহায়তা নেবেন মুসলিমদের কাছ থেকে। পরিচিত অমুসলিমরা হয়তো শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে, তবে তাদের মূল্যবোধ আমাদের চেয়ে ভিন্ন। তা ছাড়া তাদের চিন্তাভাবনা ইসলামী আদর্শের বিপরীত। তাদের ও আমাদের ভাবনার জগৎ একেবারেই আলাদা।

• কে, কী বলবে, ভাববে এসব নিয়ে পেরেশান হবেন না। শুধু ভাবুন আল্লাহ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি এই পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিয়েছ?" তাহলে আপনি আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবেন! আমাদের জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ তাআলার কাছে। আমাদের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব বা প্রতিবেশীর কাছে নয় কিংবা তার পোষা কুকুরের কাছে নয়।

• সাহায্য চাইবেন আল্লাহর কাছে। বিশ্বাসযোগ্য ও বিজ্ঞ মুসলিমের (পুরুষ অথবা নারী) কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবেন। আন্তরিক এবং সৎ থাকবেন। সবশেষে সমাধান যা-ই আসুক, মেনে নেবেন সেটা।

সাধ্যের সবটুকু দিয়ে প্রচেষ্টার পর যে সিদ্ধান্ত আসবে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। এটাই আপনার জন্য কল্যাণকর। এটাই আপনার ব্যাপারে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত।

# বিয়ে, বিচ্ছেদ ও সোশ্যাল মিডিয়া

-উম্মে খালিদ

গতকাল এক বান্ধবীর সাথে কথা বলছিলাম। সে জানাল আমেরিকার যে শহরে সে বাস করে, সেখানে চতুর্দিকে মুসলিম দম্পতিদের ডিভোর্সের ঘটনা ঘটছে।

"কেন? বিশেষ কোনো কারণ?", আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তার উত্তরটা ছিল সংক্ষিপ্ত, "সোশ্যাল মিডিয়া।"

কয়েক মাস আগেও অন্য আরেক বোন ঠিক এ রকমই কিছু বলেছিলেন। তিনি থাকেন আমেরিকার অন্য এক অঙ্গরাজ্যে। সেখানেও একই অবস্থা। আমি নিজেও এমন ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী।

কী ঘটছে আসলে? সোশ্যাল মিডিয়া আসলে ছুরি বা গাড়ির মতোই একটি জিনিস। একে ভালো কাজে যেমন ব্যবহার করা যায়, আবার ধ্বংসও ডেকে আনা যায় এর মাধ্যমে।

তবে সোশ্যাল মিডিয়া যে বিপদ ডেকে আনছে, তা আমাদের ঈমানকে ধ্বংস করতে পারে। এমনকি আমাদের বৈবাহিক জীবনকেও। সেটা ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার বা স্ন্যাপচ্যাট যেটাই হোক।

সোশ্যাল মিডিয়ার কয়েকটি সমস্যা :

## ১. আকর্ষণ

ফেসবুক হচ্ছে নেশার মতো। ইনস্টাগ্রামও তা-ই। টুইটারও একই। সেখানে কিছু লোক পাগলামির মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এসব প্ল্যাটফর্মে আপনি স্ক্রল করতেই থাকেন, করতেই থাকেন। এটা-ওটা আসতেই থাকে! অন্তহীন বিনোদন। আপনি একজনের প্রোফাইল থেকে আরেক জনের প্রোফাইলে ঘুরছেন। তাদের সকল ছবিতে ট্যাগকৃত ব্যক্তির প্রোফাইলও দেখে আসছেন। ভালোই তো লাগে। স্ক্রিনে আঙুল নাড়ানো ছাড়া

আর কিছুই করতে হচ্ছে না আপনাকে।

এত এত গল্প ও কৌতূহলের তুলনায় আপনার স্বামী বা স্ত্রীর কথা আপনার কাছে নিতান্ত নীরস ও বিরক্তিকর মনে হতে পারে। সেটাও আবার যদি সত্যিই স্ত্রী বা স্বামী আপনার সাথে কথা বলতে চান, তাহলে।

স্বামী হয়তো টুইটারে কোনো তুমুল তর্কযুদ্ধ দেখছে। স্ত্রী ইন্সটাতে স্ক্রল করছে অন্য মানুষের জীবনের ছবি। জড়িয়ে গেছে তাদের জীবনে। এই দম্পতিরা হয়তো একসাথে এক সোফায় বসে আছে, খাওয়া-দাওয়া করছে। কিন্তু কাছে থেকেও যেন কত দূরে। বাচ্চারা ঘুমিয়ে যাওয়ার পরেও তারা একে অপরের দিকে না তাকিয়ে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকতে ব্যস্ত। বাস্তব জীবনে একে অপরের পরিবর্তে কথা বলছে অনলাইনে অন্য ব্যক্তির সাথে। এখানে সংযোগ কোথায়? সুখ কোথায়?

দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী কেউই কারও দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না বলে বৈবাহিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। দুজনেই ব্যস্ত ভিন্ন দুনিয়ায়। শুরুটা হয় ধীরে ধীরে, তবে সময়ের সাথে সাথে ধারণ করে গুরুতর আকার। যোগাযোগ, চোখাচোখি ও ঘন ঘন কথোপকথনের জায়গা নিয়ে নেয় নীরবতা আর স্ক্রিনের আলো। চোখ আঠার মতো আটকে যায় ডিভাইসে। এই মনোযোগহীনতার কোনো সামধান করা না হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি লক্ষণীয় দূরত্ব তৈরি হয়। হঠাৎ করেই দেখা যাবে স্ত্রী বলছেন, "আমাদের আর বনিবনা হচ্ছে না।" স্বামী বলছেন, "আমরা একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি।"

## ২. পর্দার শিথিলতা

সোশ্যাল মিডিয়া নারী-পুরুষের মধ্যকার দেয়াল ভেঙে ফেলে। এখানে আমরা কেউই শারীরিকভাবে কারও সামনে উপস্থিত নই। বসে আছি স্ক্রিনের আড়ালে। বাস্তব জীবনে হায়া (শালীনতা) রক্ষা করা ব্যক্তিরাও সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢিলেমি শুরু করে দেন। যেহেতু যোগাযোগটা সম্পূর্ণই ইলেকট্রনিক মাধ্যমনির্ভর।

অনেক মুসলিম ভাই-বোন বিপরীত লিঙ্গের কারও চোখে সরাসরি তাকান না। অথচ অনলাইনে এসে এদেরই কেউ কেউ নির্দ্বিধায় দেখে বিপরীত লিঙ্গের কারও ছবি। অনেক মুসলিম কোনো গায়রে-মাহরামের সাথে ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপচারিতা অপছন্দ করেন। কিন্তু অনলাইনে সেটাই একদম সহজ হয়ে যায়। শালীনতাবোধ অনলাইনে এসে হয়ে যায় শিথিল।

এ রকম হলে সম্পর্কে দ্রুতই ভাঙন ধরা শুরু করে। হঠাৎ করেই একজন পুরুষ নিজের

কথা অন্য নারীর কাছে প্রকাশ করতে শুরু করেন। তার কাজের চাপ, তার হতাশা, এমনকি বাসায় স্ত্রীর সাথে তার বনিবনা না হলে শেয়ার করতে শুরু করেন সেটাও। যে নারীকে তিনি ম্যাসেজ করছেন, সেও খুব সহানুভূতিশীল শ্রোতা। স্ত্রীর কাছে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও আবেগীয় ঘনিষ্ঠতা পাচ্ছেন না, সেটা দিচ্ছেন??? অনলাইনের এক অপরিচিত নারী।

তিনি হয়তো নিজেকে আশ্বস্ত করেন এটি হারাম নয়। সহানুভূতির আদান-প্রদান মাত্র। কিন্তু আমরা সকলেই জানি এর শেষ কোথায়। একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মধ্যকার সহানুভূতি নিতে পারে রোমান্টিকতার রূপ। কারণ, নির্জনে মিলিত হওয়া নারী ও পুরুষের মাঝে তৃতীয় জন হলো শয়তান। হ্যাঁ, অনলাইন নির্জনতাও নির্জনতা।

## ৩. বাহবা প্রাপ্তি

নারী-পুরুষ প্রত্যেকে বাহবা পেতে ভালোবাসে। নিজেকে বিশেষ ভাবতে চাই সবাই। চায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, প্রশংসা শুনতে। দৃষ্টি আকর্ষণের ইচ্ছা নিজে কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হলো আমরা কার বা কাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নারীরা আবেগের দিক দিয়ে চায় আশ্বাস ও স্বীকৃতি। বেশির ভাগ নারী চায় আকর্ষণীয় হতে, আকাঙ্ক্ষিত হতে এবং সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনতে। পুরুষদের মধ্যেও এই প্রশংসা ও স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা আছে। তবে নারীদের মধ্যে বেশি। ইসলাম নারীর এই সহজাত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দেয় বিয়ের মাধ্যমে। স্বামীই সেই পুরুষ, যিনি নারীর প্রশংসা, মনোযোগ ও সৌন্দর্যের স্বীকৃতি দেয়ার একমাত্র হালাল উৎস। তবে ক্রমবর্ধমান সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের এই যুগে কিছু নারী এই প্রশংসা পাওয়ার জন্য অনলাইনে পরপুরুষের দিকে ঝুঁকছেন।

গুণগত মানের পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে পরিমাণ। একজন স্বামীর কাছ থেকে প্রকৃত, হালাল মনোযোগ পেতে আর ভালো লাগছে না। সেজেগুজে, বিভিন্ন ফিলটারসহ সোশ্যাল মিডিয়ায় সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে অসংখ্য গায়রে-মাহরামের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। লাইক, কমেন্ট, হার্ট ইমোজির মাধ্যমে অনলাইনে যে পরিমাণ পুরুষের মনোযোগ মেলে, তার সাথে স্বামীর মনোযোগ একা পেরে ওঠে না। চলতে থাকে প্রতিযোগিতার দুষ্টচক্র। আর এতে পরাজিত হচ্ছেন স্বামী।

স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিরক্ত হয়ে যান। ভাবেন যে, স্বামী তার যথেষ্ট প্রশংসা করছেন না। “অনলাইনের ভাইয়াগুলো কত্ত ভালো! এই স্বামী মিনসেটা সে রকম প্রশংসা করতে পারে না?” এখান থেকেই পরকীয়ার শুরু। শুরু ব্যভিচারের। ফলে দাম্পত্য-জীবনের

ইতি ঘটে এখানেই।

তাই সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে সাবধান। আপনার বিয়ে ও পরিবারকে রক্ষা করুন এ থেকে। অনলাইন ও অফলাইনে আপনার সমস্ত ক্রিয়াকলাপের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন।

# বহুবিবাহের বহুবিধ

-ড্যানিয়েল হাকিকাতযু

নারীবাদী ও আধুনিকতাবাদী ধ্যানধারণার প্রভাবে ইসলামের অনেক বৈধতার যৌক্তিকতা বুঝে উঠতে পারি না আমরা। যেমন : বহুবিবাহ। প্রথমেই এ-সংক্রান্ত কিছু তথ্য :

➡ সারা বিশ্বের গোটা মানব-ইতিহাসের প্রায় ৭৫% সমাজ বহুবিবাহ চর্চা করেছে। (উৎস: এথনোগ্রাফিক অ্যাটলাস)।

➡ একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমোদন কুরআনে বিদ্যমান।

“আর যদি আশঙ্কা করো যে, তোমরা এতিম (মহিলা)-দের সাথে ন্যায় বিচার করতে পারবে না, তাহলে সাধারণ নারীদের মাঝ থেকে যাদের ভালো লাগে, তাদের দুই জন, তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে করে নাও। কিন্তু যদি ন্যায় বিচার করতে না পারার আশঙ্কা হয়, তাহলে একজনই যথেষ্ট। কিংবা যে তোমাদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত, তাকেই যথেষ্ট মনে করে নাও। সীমালঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য এটাই হচ্ছে সহজতর পন্থা।”

➡ নবীজী ﷺ-এর পাশাপাশি অনেক সাহাবিও বহুবিবাহ করেছেন।

বহুবিবাহ এক ঐতিহাসিক ও সামাজিক বাস্তবতা। তাহলে বর্তমান সময়ে কিছু মুসলমানের কাছে বহুবিবাহ নেতিবাচক বিষয়ে পরিণত হওয়ার কারণ কী?

এর মূল হোতা খ্রিষ্টান চার্চ। বাইবেলে বহুবিবাহের প্রচুর উদাহরণ থাকলেও তারা ৪র্থ শতাব্দী থেকে বহুবিবাহের বিরোধিতা করতে শুরু করে। ক্যাথলিক এবং অর্থোডক্স উভয় চার্চই শেষমেশ নিষিদ্ধ করে বহুবিবাহ। একে ব্যভিচারের একটা রূপ হিসেবে গণ্য করে তারা। এই অবস্থান গ্রহণের কারণ আসলে রোমান সংস্কৃতির প্রভাব। রোমানরা ছিল কঠোরভাবে একবিবাহ ধারণার অনুসারী। এই তারাই আবার চাইত পুরুষরা পতিতাগমন করুক। পশ্চিমে বর্তমানে পতিতাবৃত্তি এবং ব্যভিচারের বিস্তারের পেছনে

চার্চের এই ভূমিকা সরাসরি দায়ী।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ পতিতাবৃত্তি প্রচলনের একটি বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কারণ, বহুবিবাহের মূল সুবিধাভোগী সমাজের উঁচু শ্রেণি। কীভাবে?

নারীরা চায় উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী পুরুষদের। পশ্চিমে 'গ্রুপি' বলে একটি কথা আছে। তা দিয়ে বোঝানো হয় এমন নারীকে, যে পছন্দের কোনো সেলেব্রিটির (গায়ক, অভিনেতা, খেলোয়াড় ইত্যাদি) সাথে আঠার মতো লেগে থাকে শুধুই যৌনমিলনের আশায়। হাজিরা দেয় তার প্রতিটি কনসার্টে বা অনুষ্ঠানে, তার জন্য যত কষ্ট করে যত দূরেই যেতে হোক না কেন। এই নারীরা সম্পদ, ক্ষমতা এবং মর্যাদার প্রতি এতটাই আকৃষ্ট যে, কয়েক ডজন প্রেমিকার একজন হতে আপত্তি নেই তাদের। এটি একটি জৈবিক আকর্ষণ। আর স্বার্থের দিকটি চিন্তা করলে এটা যৌক্তিক তাদের কাছে।

এই মহিলাদের জন্য কোনো গরিবের একমাত্র স্ত্রী হওয়ার চেয়ে বড়লোকের উপপত্নী হওয়া ভালো। সবাই যে সচেতনভাবে এমনটি চায়, তা না। এটি অনেকাংশেই অবচেতন জৈবিক তাড়না।

বিয়ের মতো স্বাভাবিক প্রতিশ্রুতিভিত্তিক সম্পর্কের পথ রুদ্ধ করে দিলে অভিজাত পুরুষ ও এ সকল নারী বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে গড়ে তোলে পতিতাবৃত্তি। এলিটরা উদ্যোগ নেয় পতিতাবৃত্তিকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে, যাতে জনসাধারণ তাদের এসব আমোদ-প্রমোদ নেতিবাচকভাবে না দেখে।

সুতরাং পতিতাবৃত্তি রোধ করার ক্ষেত্রে বহুবিবাহ একটি বড় অস্ত্র। পাশাপাশি আরও অনেক বিষয় আছে, যা আলাদা আলোচনার দাবিদার।

তবে বর্তমানে কিছু মুসলিম নারীর কাছে বহুবিবাহের ধারণাটি দৃশ্যত আপত্তিকর। ব্যক্তিগত আবেগ দিয়ে চিন্তা করেন বলেই এই সমস্যা। আবেগ থেকে বেরিয়ে আসুন। আপনি ব্যক্তিগতভাবে দ্বিতীয় স্ত্রী হতে চান না, তার অর্থ এই নয় যে, সবার বাস্তবতা একই। অনেকের কাছে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী হওয়াটাই সর্বোত্তম বিকল্প। অনেক নারীই তালাকপ্রাপ্ত, বিধবা, এমনকি সসন্তান। তাদের দরকার অবলম্বন। বহুবিবাহ তাদের জন্য খুবই কার্যকর সমাধান।

নারীবাদীরা এসব নারীদের ক্ষতি করছে। পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমরাও বঞ্চিত হচ্ছে একটি সুন্নাতের চর্চা থেকে।

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে এক নারী একাধিক স্বামী রাখতে পারে না কেন? এটা কি সমতা হলো? এই আপত্তি বেশির ভাগই আসে অল্পবয়সিদের কাছ থেকে, যাদের জীবন নিয়ে অভিজ্ঞতা কম।

যারা পরিপক্ক, তারা এক সেকেন্ডের জন্য ভাবুন। সহস্বামী হতে হলে পুরুষকে কেমন হতে হবে? শক্তিশালী, সফল, আত্মবিশ্বাসী, ধনী, সুদর্শন? নাকি এগুলোর বিপরীত? এখন এমন একজন নারী কল্পনা করুন, যিনি এ রকম একাধিক লুজারকে বিয়ে করতে চান। কল্পনা করাও কঠিন। এ কারণেই গোটা মানব-ইতিহাসের মাত্র দুই-একটি ছোট উপজাতিতে বহুপতি সমাজ রয়েছে। তাও বিলুপ্তপ্রায়।

অন্যদিকে বহুপত্নীক সমাজব্যবস্থাকে খ্রিষ্টান চার্চ যদি খারাপ না বানাত, তাহলে সম্ভবত আজও এর চর্চা হতো খুব স্বাভাবিকভাবে। অন্তত মুসলিমদের মাঝে। অথচ কীভাবে খ্রিষ্টান ও নারীবাদী ধ্যানধারণা আজ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছে! আল্লাহ রক্ষা করুন।

শেষকথা, মুসলিম পুরুষদের জন্য বহুবিবাহ একটি আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার। কিন্তু তাই বলে কি প্রতিটি পুরুষের জন্যই তা আচরণীয়? না। এখানে অনেক বিষয় বিবেচনায় রাখার আছে। একটি বড় নিয়ামক হলো প্রথম স্ত্রীর অনুভূতি। লক্ষ করুন। অনুমতি নয়, অনুভূতি।

অধিকার থাকা মানেই তা হাপুস-হুপুস করে আদায় করে নেওয়া নয়।[২৭] দাম্পত্য সফল হওয়ার অন্যতম নিয়ামক হলো জীবনসঙ্গীর সাথে সুবিবেচনাপূর্ণ আচরণ করা এবং আবেগ-অনুভূতির মূল্য বোঝা। সুবিবেচক পুরুষের কাছে যৌনাঙ্গই একমাত্র বিবেচ্য নয়। স্ত্রী-সন্তানের চাহিদাও তার উদ্বেগের জায়গা। তেমনি সুবিবেচক নারীও তার আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ-বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম।

[২৭] সম্পাদকের সংযোজন : এর সাথে তুলনা করুন "নারীত্ব থেকে স্ত্রীত্ব" প্রবন্ধে উল্লেখিত স্বামীর জন্য রান্না করার বিষয়টি। খাবার রান্না করা স্ত্রীর ওপর শারঈভাবে বাধ্যতামূলক নয়। স্বামীর দায়িত্ব, খাওয়ার উপযোগী অবস্থায় আহার্যের জোগান দেওয়া। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে পুরুষরা অর্থোপার্জন আর নারীরা রান্নাবান্না করেন, কারণ এই শ্রমবিন্যাস বাস্তবসম্মত। বাস্তবতার খাতিরে বেশির ভাগ নারী একটি শারঈ অধিকার ছেড়ে দিচ্ছেন।

# বাবা!

-উম্মে খালিদ

কন্যার পিতারা, কন্যাদের ভালোবাসুন। স্নেহশীল হোন তাদের প্রতি। পিতা-কন্যার সম্পর্কের গুরুত্ব নিয়ে যতই বলা হবে, কম হয়ে যাবে। একটি মেয়ে একজন ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক নারী হিসেবে বড় হওয়ার জন্য অবশ্যই একজন দৃঢ় ও দায়িত্বশীল বাবার প্রয়োজন।

বাবা যদি হয় অযোগ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন, যত্নহীন, খুব কঠোর বা অতি-শিথিল, তাহলে পুরুষদের প্রতি খুবই নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে কন্যারা। প্রায়ই এ-জাতীয় মেয়েরা মরিয়া হয়ে বাবার ভালোবাসার একটি বিকল্পের সন্ধান করে। অনেকটা অবচেতনভাবেই। কোনো পুরুষের ভালবাসা। যেকোনো পুরুষ!

গ্যাবর ম্যাটের *"When the Body Says No"* বইটি পড়ছি। বইটির বিষয়বস্তু ভিন্ন। তবে এই অংশটি এখানে প্রাসঙ্গিক,

"মায়ের সাথে গিল্ডার সম্পর্ক খুব খারাপ। বাবার মনোযোগ পাওয়ার জন্য সে মায়ের সাথে একধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকত। গিল্ডা বলেছিল যে, বাবা ছিলেন তার 'জীবনের ভালোবাসা'। তার যখন ১২ বছর বয়স, তখন মস্তিষ্কের ক্যান্সারে মারা গিয়েছিলেন তার বাবা। তা অপূরণীয় ক্ষতি ছিল তার জন্য।

নিদারুণ হতাশার কারণে তরুণ গিল্ডা উদ্ভ্রান্তের মতো পুরুষের কাছে প্রেম এবং গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে বেড়ায়। সে লিখেছে, 'আমার জীবনটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আমার পছন্দের পুরুষের কথায়।' সে ওইরকম নারী হতে চাইত, যে-রকমটা তার জীবনের কাঙ্ক্ষিত পুরুষটি পছন্দ করত।"

আসলে ছেলেমেয়ে সবার ক্ষেত্রে এটা সত্য। শৈশবের ঘটনাগুলো প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের গতিবেগকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই আমাদের সুস্থ, মনোযোগী এবং দায়িত্বশীল বাবা-মা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের ক্রিয়াকলাপ এবং নিষ্ক্রিয়তা কেবল আমাদের বাচ্চাদের শৈশবকেই নয়, যৌবনকেও রাঙিয়ে দেয়। তাদের শারীরিক,

মানসিক, আবেগীয় ও ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করতেই হবে আমাদের। ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে আমাদের প্রেম, উচ্ছৃঙ্খলা, করুণা ও ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে।

বাবা-ছেলে, মা-ছেলে এবং মা-মেয়ে সম্পর্কও অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আপাতত আসুন পিতা-কন্যার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলি।

আয়িশা ﵂ বলেন, “কথাবার্তা আর চালচলনে ফাতিমা একদম ওর আব্বুর মতো। আর কারও সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এত মিল দেখিনি। ফাতিমা তাঁর ঘরে আসলে তিনি উঠে গিয়ে তার কপালে চুমু দিতেন। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে হাত ধরে এনে বসিয়ে দিতেন নিজের বসার জায়গায়। আবার রাসূল ﷺ যখন ফাতিমার বাসায় যেতেন, ফাতিমাও একইভাবে দাঁড়াত, তাঁকে চুমু দিত।”[২৮]

বাবা-মেয়ের মধ্যে কতই-না সুন্দর বন্ধন। ফাতিমা ﵂-কে কখনোই বাবার ভালোবাসার প্রতিস্থাপন খুঁজতে হয়নি। তিনি ও তার বোনেরা নিয়মিত পিতৃস্নেহ ও মনোযোগ পেয়েছেন। শেষ নবী হিসেবে তাঁদের পিতার কাঁধে ছিল বিশাল দায়িত্বের ব্যস্ততা। অথচ ঠিকই কন্যাদের জন্য সময় বের করে নিতেন তিনি।

প্যারেন্টিংসহ সব ক্ষেত্রেই তো সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ﷺ-কে আমরা রোল মডেল মানি। চার জন পুণ্যবতী কন্যাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করেছেন তিনি। উম্মাহর মেয়েরা কি তাদের বাবাদের কাছে অন্তত এর কিছুটা আশা করতে পারে না?

---

[২৮] তিরমিযি : ৩৮৭২

# মায়ের দিনরাত্রি

-উম্মে খালিদ

আমার চতুর্থ বাচ্চা হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। চার জনকেই নিয়ে গেলাম শহরতলির একটি মিউজিয়ামে। বাচ্চাদেরও বেশ ভালো লাগল। তারা খেলাধুলা করল, শিখল নতুন কিছু। এদিকে খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম আমি। তবে এটা ভেবে ভালো লাগল যে, চার জনকে একসাথে নিয়ে প্রথমবারের মতো বেড়ানোটা সফল, আলহামদুলিল্লাহ।

বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার আগে বাচ্চাদের লাঞ্চ করতে দিলাম। এর পরপরই সব উল্টাপাল্টা হতে শুরু করে।

এই সময় বাচ্চাদের বয়স ছিল যথাক্রমে সাড়ে পাঁচ, চার, তিন এবং খালিদ ছিল কয়েক সপ্তাহ বয়সের। আমি পাথরের বেঞ্চের ওপর বসে ছিলাম। তিন বছর বয়সি ছেলেকে টুনা স্যান্ডউইচ দিচ্ছিলাম এক হাত দিয়ে। আরেক হাত দিয়ে কোলের জনকে নার্সিং করছি। অন্য দুই বাচ্চা সবেমাত্র খাওয়া শেষ করে খেলছিল কাছেই। তিন বছর বয়সি ছেলে বেঞ্চ থেকে পিছলে পড়ে গিয়ে তার হাতে আঘাত পায়। তেমন ব্যথা না পেলেও ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে। বলে দিলাম আরও সাবধান থাকতে।

এরই মধ্যে পেছন থেকে চেঁচামেচির শব্দ। কী হলো? খালিদকে খাওয়াতে খাওয়াতেই পেছন ফিরে দেখি বড় দুই ছেলে মারামারিতে ব্যস্ত। দিলাম বকা। এক নম্বরটা দুই নম্বরকে মেরে কাঁদিয়ে দিয়েছে।

আবার পেছন থেকে তীব্র কান্না। ফিরে দেখি তিন বছর বয়সিটা ওই এক ছাতার বেঞ্চেই আবার ব্যথা পেয়েছে। কপালে লাল রঙের ক্ষত ফুলে উঠছে এর মধ্যেই।

ইচ্ছে হলো নিজেই কেঁদে ফেলি। পুরো হতভম্ব অবস্থা আমার। চার জনকে একাই সামলানো লাগবে। তার ওপর ওটা আমার দায়িত্বের ছোট একটা অংশমাত্র। বাচ্চাদের যত্ন নেওয়া ছাড়াও আছে খাবারের পরিকল্পনা, কেনাকাটা, রান্না, পরিষ্কার করা, শিশু

বিশেষজ্ঞের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, হোমস্কুল, নিজের কুরআন তিলাওয়াত, আমার নিজের শখ, বন্ধুবান্ধব। এতকিছুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা কীভাবে সম্ভব?

সব মায়েরই এভাবে হিমশিম খেতে হয়। কত মা যে আমাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন পাঠায়, বিশ্বাস করবেন না। সত্যি বলতে, এটার কোনো একক উত্তর নেই। আমাকেও বেগ পেতে হয় অধিকাংশ সময়।

তবে তালিকা তৈরি করা আমার নেশা। সুসংগঠিত কাজ করতে পছন্দ করি আমি। অন্তত মাঝেমধ্যে। তাই এ রকম কিছু পদক্ষেপের একটা তালিকা দেখে নিতে পারেন।

## ১. মগজ পরিষ্কার

আপনি যেসব কাজ করতে চান, কাগজ-কলম নিয়ে তা লিখে রাখুন। কোনো নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানো লাগবে না। লিখুন, ব্যস।

## ২. অগ্রাধিকারকে প্রাধান্য

কাগজে সম্ভবত অনেক কিছুই লেখা আছে, তাই না? জেনে রাখুন যে, সবকিছু জীবনেও করতে পারবেন না। এটা মানতে কিছুক্ষণ সময় লাগবে। আপনার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কোনগুলো? অগ্রাধিকার অনুযায়ী তালিকা করুন এবার।

কিছু জিনিস তালিকা থেকে পুরোপুরি বাদ দিতে হতে পারে, যদি বেশি অপ্রয়োজনীয় হয়। দিনে মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময়। গুরুত্বহীন জিনিস কম করলেও চলে। নিজেকে খুব বেশি কষ্ট না দিয়ে সর্বাধিক প্রোডাক্টিভ হওয়াই হবে আপনার উদ্দেশ্য। কীভাবে চললে সেটা সম্ভব, তা বের করুন। তারপর সেভাবেই চলুন। এটা অতিক্রম করবেন না।

বাড়াবাড়ি করলেই কিন্তু শেষ! জীবন থেকে কিছু অতিরিক্ত জিনিস বাদ দেওয়া প্রয়োজন। নাহলে দেখা দেবে অনিদ্রা, উদ্বেগ, খিটমিটে ভাব, হতাশা, দীর্ঘ অবসন্নতা ও অন্যান্য সমস্যা। আমি জানি কারণ আমিও আগে এসব বিপদে পড়েছি।

## ৩. দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজ

সব কাজই প্রতিদিন করতে হয় না। তাই দৈনিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে কাজ ভাগ করে নিন। আবার কিছু কাজ সপ্তাহান্তে না করে মাসে একবার করলেও হয়।

## ৪. দিনের প্রতিটি অংশের ধারাবাহিক রুটিন

রুটিনে অভ্যস্ত থাকলে কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যেতে থাকে। প্রতিটি একক কাজ সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করতে হয় না। তেমনটা করতে হলে দুপুরের মধ্যেই পাগল হয়ে যাবেন আপনি।

## ৫. ঘুমের রুটিন

আগের রাতে যথেষ্ট ভালো ঘুম হলে পুরো দিনটাই ভালো কাটে। ঘুমোতে খুব বেশি দেরি করবেন না। একেকজনের একেক কারণে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। আপনার ক্ষেত্রে সেটা কী, তা খুঁজে নিন। বেশির ভাগ ছোট বাচ্চার মায়েরা মারাত্মকভাবে ঘুম থেকে বঞ্চিত। ঘুম খুব জরুরি।

## ৬. সকালের রুটিন

পারলে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে জেগে উঠুন। তাহলে চনমনে থাকে শরীর। অবশ্যই বাচ্চাদের আগে জেগে ওঠার চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় এতে মেজাজ এবং প্রোডাক্টিভিটিতে বিশাল প্রভাব পড়ে। বাচ্চাদের হই-হুল্লোড় শুরুর আগেই চিন্তা গুছিয়ে নেওয়ার সময় পাওয়া যায় এর ফলে।

ফজর তো পড়বেনই। এরপরে যথারীতি যা কিছু নফল আমল আছে, সেগুলো। প্রতিদিন অন্তত এক পৃষ্ঠা বা এক আয়াত হলেও কুরআন তিলাওয়াত, খানিকটা যিকির-আযকার। এটা হচ্ছে মায়েদের নিজের ধর্মীয়, মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক যত্নের উপায়।

সব সময় তা সম্ভব হবে না। মাঝেমধ্যে আপনার ছোট্ট বাবুটা কাঁদতে কাঁদতে আপনাকে জাগিয়ে তুলবে। আপনাকে ফজরের সালাত পড়তে বাধ্য করবে বাবুটাকে কোলে রেখে। এটাও জীবনের একটা পর্যায়।

তারপরে আপনার দিনের বাকি অংশটিতে চোখ বুলিয়ে নিন। বাচ্চাদের ডায়াপার বদলানো, নাস্তা, বাসার কাজ, হোম স্কুল ইত্যাদি।

তারপর বিকেলের রুটিন।

তারপর সন্ধ্যার রুটিন।

তারপর আবার রাতের রুটিন। অবশেষে দিনের সব চাপ থেকে মুক্ত।

## ৭. অল্প হোক তবুও হোক নিয়মিত

নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজের বাইরে আরও যা কিছু যোগ করতে চান, সেগুলোও যোগ করুন আপনার দৈনন্দিন সময়সূচিতে। পড়তে ভালোবাসলে দৈনিক ২০ মিনিট হলেও পড়ার সময় হিসেবে নির্ধারণ করার চেষ্টা করুন। দেখুন কোন সময়ে হলে আপনার জন্য ভালো। হতে পারে সেটা রাতের খাবারের পরে বা ঘুমানোর আগে।

ব্যায়াম করতে চাইলে নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট সময় বেছে নিন। এমনকি খুব কম সময় হলেও। কদাচিৎ একবারে অনেক কিছু করার চেয়ে ধারাবাহিকভাবে অল্প অল্প করাও ভালো। হাদীসে যেমনটা আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

## ৮. সাপ্তাহিক রুটিন

প্রতিদিন যে কাজগুলো করার প্রয়োজন হয় না, সেগুলো সাপ্তাহিকভাবে করা যায়। সপ্তাহে এমন একটি দিন ও সময় বেছে নিন, যখন এই কাজগুলো করা উপযুক্ত। আমি সাধারণত সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে একবার কেনাকাটা করি।

## ৯. সাফাই রুটিন

ঘর পরিষ্কার করাকেও দৈনিক এবং সাপ্তাহিক এই দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়।

দৈনিক সাফাই : যেসব সাফাই না করলেই নয়, সেগুলো হবে দৈনিক। যেমন রান্না ও খাওয়ার পর থালাবাসন, বেসিন, রান্নাঘর পরিষ্কার করা, গোছানো। বাচ্চারা যথেষ্ট বড় হলে ওদেরও এতে সাহায্য করতে বলুন। এটি আপনার ও বাচ্চার উভয়ের জন্যেই ভালো।

সাপ্তাহিক সাফাই : এই শ্রেণিতে পড়বে বাথরুম-বেডরুম সাফাই, পুরো ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি। এগুলো এমন কাজ, যা প্রতিদিন করার সময় নেই। তবে করতে হবে। আমি এগুলো করি সাপ্তাহিক ছুটির দিনটায়। আমার স্বামী তখন বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে যায়। কারণ, এসব বড় বড় কাজের ফাঁকে আবার বাচ্চাদের দিকে মন দেওয়া দুরূহ।

সব নিজে করতে না পারলে কাজের লোক রাখতে পারেন। যে পরিবারের যে রকম হলে সুবিধা।

## ১০. রান্নার রুটিন

এটি নির্ভর করে আপনার নিজের পরিস্থিতি এবং পরিবারের পছন্দের ওপর। সেই

অনুসারে ব্যাপক পরিবর্তনও হতে পারে। কেউ কেউ একবারে বেশ কয়েকদিনের খাবার রান্না করে ফ্রিজে রেখে দেন। অন্যরা প্রতিদিন রাঁধে। যার যেটা সুবিধা। বুঝতেই পারছেন যে, এটাও ব্যক্তিভেদে দৈনিক বা সাপ্তাহিক যেকোনো এক শ্রেণিতে পড়বে।

আমার একটি রেসিপি বাইন্ডার আছে। রান্নাঘরের ড্রয়ারে রাখি সেটা। আমার প্রতিদিনের ডিনারের সব রেসিপি আছে এতে। কী রান্না করব, এটা ঠিক করতেই আগে আমার অনেক সময় চলে যেত। বাইন্ডার থাকায় সে ঝামেলা নেই এখন। প্রতিদিন যা রান্না করি বা একবার হলেও যা রান্না করার চেষ্টা করেছি, সব সেখানে লেখা। আমি শুধু একবার চোখ বুলিয়ে একটা রেসিপি বেছে নিই। তারপর পরবর্তী কাজে চলে যাই।

এগুলো আমার টপ টেন টিপস। আমি নিজেও সব সময় এসব শতভাগ বাস্তবায়ন করতে পারি না। ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আসলেই কঠিন। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করা চাই অন্তত।

# কেন এই নিঃসঙ্গতা?

-উম্মে খালিদ

মায়ের পথচলা কখনো কখনো হতে পারে খুবই নিঃসঙ্গ।

গতকাল এক বান্ধবীর সাথে কথা বলছিলাম। স্মৃতিচারণা করছিলাম সেই সময়গুলোর, যখন মা হিসেবে নিজেদের মনে হতো বড় একাকী, নিঃসঙ্গ । আমরা দুজনই সেই অনুভূতিটির সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিত।

আমার প্রথম সন্তানের জন্মের পরের কথা। একেই তো নতুন মা, তার ওপর থিতু হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন আরেক স্টেটে। কাউকে চিনিই না সেখানে। বান্ধবী তো দূরের কথা। এই নতুন জায়গায় আমার বড্ড একা ও অপরিচিত অনুভূত হতো।

মা হয়ে গেছি, এই অনুভূতির একটা শিহরন তো ছিলই। সন্তানকে ভালোবাসতামও প্রাণভরে। কিন্তু তাতে পূরণ হয় না সেই তীব্র শূন্যতা ও অনিশ্চয়তার অনুভূতি। নতুন মাকে এই বিষয়গুলোর সম্মুখীন হতে হয় পোস্টপার্টাম হরমোনজনিত কারণে। প্রথমবার একটি ছোট্ট বাচ্চার সাথে প্রতিদিনের জীবনে সংগ্রামে নামতে হয় তাকে।

আমি খোঁজ করতাম আমাদের স্থানীয় মসজিদে বোনদের কোনো হালাকা হয় কি না। দেখলাম সে রকম কিছু নেই। হতাশ হয়ে যেতাম আরও। আরও একাকিত্ব বোধ করতাম তখন।

স্বামী যতই যত্নশীল হোক এবং যতই ভালোবাসুক, একজন নারীর কথা বলার জন্য আরেকজন নারীর প্রয়োজন।

অবশেষে কয়েক বছরের দীর্ঘ একাকীত্বের পর এক বোন আমাকে একটি ব্যক্তিগত হালাকায় আমন্ত্রণ জানালেন। একজনের বাসায় হতো এই হালাকা। এই বোনেরা খুবই ভালো। আর আমিও অবশেষে আরও কিছু বোনের সান্নিধ্য পেয়ে খুশি হলাম।

তবে খুব শীঘ্রই বুঝতে পারলাম সবকিছু এত সহজ নয়। সবাই এখানে ভিন্ন

মানসিকতার। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল ভিন্নতা। এই বোনেরা যথেষ্ট ভদ্র ও বিনয়ী। তবে তাদের কারোরই নতুন বন্ধুর প্রয়োজন ছিল না। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হতো অনেকটাই আনুষ্ঠানিক, নিয়ম রক্ষার মতো। আমি ছাড়া বাকি সবাই পূর্বপরিচিত, কেউ-বা একসাথে বড় হয়েছে। কেউ ছিল আত্মীয়। আমিই শুধু সম্পূর্ণ বহিরাগত। তাদের একজন হতে পারার উপায় ছিল না।

এবার একলাফে চলে আসি আরও কয়েক বছর পরের কথায়। আরও কয়েক বাচ্চার মা হলাম। আরও কিছু জায়গা বদলের পর আলহামদুলিল্লাহ আমার পরিস্থিতি এখন ভিন্ন। আমার মতোই কিছু বোনদের দেখা পেয়েছি, যারা অত্যন্ত ভালো বন্ধু। আমরা আমাদের বাচ্চাদের দুষ্টুমি এবং মাতৃত্বের প্রতিদিনের ঝুটঝামেলা নিয়ে একসাথে হাসি, আনন্দিত হই। কাপড় ধোয়ার টিপস শেয়ার করি। খাবার বিনিময় করি আর স্বামীরা কী বলল না বলল, এসব নিয়ে গল্প করি (গিবত না অবশ্য, ভালো ভালো কথাই)। স্বীকার করি মা হিসেবে নিজেদের ভুলগুলো। নিজেদের নিত্যদিনের অপরাধবোধকে হালকা করার চেষ্টা করি আমরা। জীবনের নানান সমস্যার ব্যাপারে একে অন্যকে সহানুভূতি জানাই। অবশ্যই যেগুলো শেয়ার করার যোগ্য, শুধু সেগুলো। একে অপরকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করি। পাশে থাকি একে অপরের প্রয়োজনে।

সহানুভূতিশীল বন্ধু থাকা প্রায় থেরাপির মতোই। মা হিসেবে আমি একাকিত্ব যেমন বোধ করেছি, তেমনি পাশে পেয়েছি বন্ধুদের। বন্ধু জীবনকে আরও সহজ করে তুলতে পারে। তাই একাকী অনুভূত হলে অন্যান্য মায়েদের খুঁজে দেখুন। একসময়-না-একসময় কেটে যাবে এই নিঃসঙ্গতা। ইনশাআল্লাহ, যেকোনো পরিস্থিতিতেই আল্লাহর ইচ্ছায় উত্তম পরিবর্তন আসতে পারে।

প্রথমবার মা হচ্ছে বা হয়েছে, এমন কোনো বোন সম্পর্কে জানতে পারলে তার সাথে যোগাযোগ করুন। তাকে জানতে দিন যে, আপনি ও আপনার বান্ধবীরা তাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। তাকে বুঝতে দিন যে, তার জন্য এমন-সব বোনেরা আছে, যাদের সাথে সে আন্তরিক কিছু সময় কাটাতে পারবে। আপনাদের কোনো আয়োজনে তাকে আসতে আমন্ত্রণ জানান। তাকে জানতে দিন যে, তিনি একা নন।

একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতার ফলে যে বিষণ্ণতা দেখা দেয়, সেটা সত্যি। কিন্তু পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন (পিপিডি) একদমই পৃথক বিষয়। এটা সাধারণ মন খারাপ নয়। এতে মস্তিষ্কের রাসায়নিক উপাদান ও হরমোনের পরিমাণে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। সব মা পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনে ভোগেন না বটে। তবে অনেকেই ভুক্তভোগী। এমনকি যারা ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেসড হন না, তারাও একাকিত্ব অনুভব করলে বিষণ্ণতা ও উৎকণ্ঠার

মধ্য দিয়ে যেতে পারেন।

নতুন মায়েরা চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন যে, সবার জীবন আপন গতিতে ছুটছে। আর তিনি একাই শুধু ছোট্ট একটা মানুষ কোলে নিয়ে তুষারিত???, গতিহীন।

মনে রাখবেন, মুসলিম হিসেবে আমাদের আছে সামষ্টিক দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক বন্ধন। যেখানে অন্যান্য সংস্কৃতিতে প্রাধান্য দেওয়া হয় চরম আত্মকেন্দ্রিকতাকে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﵄ বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন ইসলাম সর্বোত্তম?" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ক্ষুধার্তদের খাদ্য দেওয়া এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।"[২৯]

তাই বন্ধু খুঁজুন, বন্ধু হোন। বিশেষত মা হিসেবে অন্য মায়ের।

---

[২৯] মুসলিম : ৪২

# ক্লান্ত মায়ের দ্বীনদারি

-উম্মে খালিদ

পিচ্চি বাচ্চাদের ক্লান্ত মায়েরা প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করেন, "নিজের ঈমানের যত্ন কীভাবে নেব বলুন তো! চারপাশে বাচ্চাদের ক্যাঁচক্যাঁচানি। খুশু নিয়ে সালাত আদায় করাই তো কঠিন। কুরআন তিলাওয়াতও হচ্ছে না নিয়মিত। মনে হচ্ছে আমার দ্বীনদারি কমে যাচ্ছে। কিছু টিপস দিন না!"

যেসব মা-বাবা এ রকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা।

আপনার পরিস্থিতি আমি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। একাধিক ছোট বাচ্চার মা হিসেবে আমি নিজেও এর সাথে পরিচিত। এটাই মাতৃত্বের মূল লড়াই। বাচ্চাদের যত্ন নিতে গিয়ে কীভাবে নিজের ঈমান ও হিম্মত অটুট রাখব? এই প্রশ্ন আপনার একার নয়। কিন্তু এরও একক কোনো উত্তর নেই। তবে কিছু ছোটখাটো পরামর্শ অনুসরণ করা যায়।

➡ নিজের শারীরিক, ধর্মীয় ও মানসিক যত্নের জন্য একটি শিডিউল তৈরি করুন। বিস্তারিত লিখুন সব করণীয়। সব মানে সব! এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, কুরআন তিলাওয়াতের সময়, যিকিরের সময় এগুলোও। মোটেও মজা করছি না। লিখে রাখলে মস্তিষ্কে সব জিনিস একসাথে রাখতে হয় না। বাচ্চা পালতে গিয়ে প্রতিটি মুহূর্তেই কোনো-না-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। মস্তিষ্কের বিরাট অংশ তো আগে থেকেই দখল করে রাখে এগুলো। বাচ্চাদের চিৎকার চেঁচামেচির ভিড়ে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ করতে ভুলে যাওয়া তাই স্বাভাবিক। সুতরাং সবকিছু লিখে রাখুন এবং সময়ে সময়ে চেক করে দেখুন।

➡ বাচ্চাদের আগেই ঘুম থেকে উঠে যান। এতে মা হিসেবে ডিউটি শুরু করার আগে ব্যক্তি হিসেবে নিজের চিন্তাভাবনা আরামসে গুছিয়ে নেওয়ার সময় মেলে। দিনটাও ভালো কাটে। বাচ্চার চিৎকারে চমকে আলুথালু বেশে ঘুম থেকে ওঠার চেয়ে এটা ভালো। সন্তানের সাথে দিনের প্রথম সাক্ষাৎটাও হবে পরিচ্ছন্ন। জড়িয়ে ধরে, চুমু দিয়ে

স্বাগত জানাতে পারবেন তাদের।

➡ সকালের ওই নীরবতার মাঝেই বেশির ভাগ নফল ইবাদত সেরে ফেলুন। কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, দুআ। দিনের অন্য সময়ও করবেন, সমস্যা নেই। বাচ্চারা তো আপনাকে দেখেই শিখবে। তবে নিজের আত্মিক উন্নতির জন্য তাদের শোরগোল শুরুর আগেই কিছু কাজ এগিয়ে রাখা উচিত।

➡ অন্য যেকোনো কিছুর মতোই আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে আন্তরিকভাবে প্রচুর দুআ করুন। বিশেষ করে সালাতে খুশুর জন্য এবং কুরআন হিফযে ধারাবাহিকতার জন্য।

রাসূল ﷺ আমাদের একটি সুন্দর দুআ শিখিয়েছেন।

“হে আল্লাহ, আমাকে তোমার যিকির ও শোকর আদায় করার তাওফিক দাও এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার তাওফিক দান করো।”[৩০]

আল্লাহর সাহায্য থাকলে সবই সম্ভব। তাঁর কাছে ছোট-বড় কোনো কিছুই চাইতে দ্বিধা করা উচিত নয়। আল্লাহ সকল মা-বাবা এবং সকল মুসলমানের ঈমানকে সুদৃঢ় করে দিন, আমীন।

---

[৩০] মুসনাদু আহমাদ : ২২১১৯

# চাপ নিস না!

-উম্মে খালিদ

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা আধুনিক জীবনে নারীরা মাঝে মাঝে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করে। এত দিকে একসাথে মন দিতে হয় যে, হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আমি নিজেই এর জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। নিজেকে যে আমি কত কাজের চাপ দিয়ে রেখেছি, তা গুনে শেষ করা অসম্ভব। প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক চাপ অনুভব করি এতে।

আমাদের আসলে নিজেদের প্রতি আরও সদয় হওয়া প্রয়োজন। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা নিয়ে তেমন কথাই হয় না আজকাল। তাই আমরা ধরে নিই যে, আমার সাথেই শুধু এ রকম ঘটছে। বেড়ে যায় নিজের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা। এই চাপ ও নেতিবাচকতা আরও বাড়িয়ে দেয় নারীবাদী মানসিকতা।

খ্যাতিমান লেখক অ্যালিস ভন হিলডেব্র্যান্ড তার *"The Privilege of Being a Women"* বইয়ে লিখেছেন,

"নারীরা একসময় গির্জা, রান্নাঘর ও শিশুদের মাঝেই নিজেকে খুঁজে পেত। নারীবাদ সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিয়ে পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতাকে বানিয়েছে পরিচয়ের মানদণ্ড। নারীবাদী দার্শনিক ডি বেভোয়ারের মতে, গৃহস্থালি কাজ থেকে মুক্তি 'এক বিশাল অর্জন।' অথচ এর ফলাফল হলো, নারীরা এখন নির্যাতিত হচ্ছে এক অযৌক্তিক আধুনিক জাঁতাকলে। তাদের একদিকে যেমন ঘরের রানিও হতে হয়, আরেকদিকে টিকে থাকতে হয় কর্মক্ষেত্রের ইঁদুরদৌড়ে।"

নারীবাদ নারীদের বলে যে, পুরুষ যা কিছু করতে পারে, নারীরাও সেসব পারে (একটু নড়বড়েভাবে আরকি)। এভাবে নারীবাদ নারীদের অনেক বেশি চাপ নিতে বাধ্য করছে। ভন হিলডেব্র্যান্ড যেটাকে অভিহিত করেছেন 'নির্যাতন' বলে।

করতে পারা মানেই কি করতে বাধ্য থাকা?

স্বাধীনতার কথা বলে যে নারীবাদ আসলে বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছে, এই বাস্তবতা বুঝতে

পারছেন অনেক আধুনিক নারী। সবদিকে সবকিছু অর্জন করার চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন অনিবার্যভাবে। হতাশা, উদ্বেগ তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। নিজের অবমূল্যায়ন করছে তারা। মানসিক ধকল সামাল দিতে চিকিৎসার??? শরণাপন্ন হতে হচ্ছে নারীদের।

*"The Fringe Hours: Making Time For You"* নামে একটি বইয়ের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো। এই বইয়ের উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমা আধুনিক নারীদের জীবন থেকে অতিরিক্ত বোঝা নামাতে সহায়তা করা।

"দিন বা সপ্তাহের শেষে এসে আপনি কি শূন্য, রিক্ত অনুভব করেন? সবাইকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে নিজের মধ্যে শূন্যতা অনুভবের বিষয়টি অনেক নারীর জন্যই বাস্তবতা। বইটির জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে আমি অনেক নারীর ওপর জরিপ করেছি। তাদের কাছে জানতে চেয়েছি বর্তমানে একজন নারী হওয়ার সবচেয়ে কঠিন দিকটি সম্পর্কে। তাদের সবার উত্তর ছিল, প্রত্যাশা পূরণের চ্যালেঞ্জ।

আসুন জেনে নিই কিছু নারীর মনের কথা। প্রশ্নটি ছিল, 'বর্তমানে একজন নারী হওয়ার সবচেয়ে কঠিন দিকটি কী?'

লিলি বলেন, 'সবকিছু হতে হবে, সবকিছু করতে হবে–এই চাপ। উচ্চশিক্ষিতও হওয়া লাগবে, চাকরিও করা লাগবে, পরিবারের রুটিরুজিও জোগাতে হবে, সফল ক্যারিয়ার থাকতে হবে, সুন্দর ছিমছাম বাড়ি থাকা লাগবে, আবার সংসারের কাজও লাগবে।'

বেকা বলেন, 'সবকিছু করব, মানুষের এমন প্রত্যাশার অনুভূতি। ভালো ক্যারিয়ার থাকতে হবে, একদম টিপটপ বাড়ি থাকতে হবে, ফিটফাট বাচ্চা থাকতে হবে, আবার রাঁধুনীও হতে হবে সেরা মানের।'

বেথানি বলেন, 'স্রেফ পারি বলেই আমি যেন সবকিছু করতে দায়বদ্ধ। মানা করা আমার পক্ষে কঠিন।'

আর এরিন বলেন, 'মানুষজন ভাবে যে, প্রতিটা কাজ আমাকে নিখুঁতভাবে করতে হবে। পরিবার চালানো, ক্যারিয়ার গড়া, বাসার কাজ করা, সমাজে অবদান রাখা–সব! অথচ কোনো মানুষের পক্ষে একা এসব করা প্রায় অসম্ভব।'"

দেখুন, এই নারীদের সবার মূল বক্তব্য ঘুরেফিরে একই। এতে কি আমাদের হুঁশ ফিরে আসা উচিত নয়? ঘরের ভেতরে ও বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করা শ্বাসরোধ হওয়ার মতো। ভন হিলডেব্র্যান্ড যেমনটা বলেছিলেন, একই সাথে 'ঘরের রানি' ও

‘কমপিটিটিভ ওয়ার্কার’ হতে চায় নারীরা। এটা অত্যন্ত ক্লান্তিকর।

অন্যদিকে, ইসলাম নারীদের কিছু অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয় না। নারীদের কাছে প্রত্যাশা করে না যে, তাকে মহাশিক্ষিত হতে হবে, দুর্দান্ত ক্যারিয়ার গড়তে হবে, আয়-রোজগার করতে হবে। ইসলাম বিয়ের মাধ্যমে স্পষ্টতই প্রতিটি লিঙ্গের ভূমিকার রূপরেখা দিয়েছে অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে। যাতে নারী বা পুরুষ কেউই অত্যধিক চাপ অনুভব না করে।

আমরা নারী হিসেবে সহজাতভাবেই মমতাময়ী। আমরা আমাদের চারপাশের লোকদের মায়া-মমতা দিতে ভালোবাসি। মেয়ে হিসেবে আমাদের ভাইবোন, বাবা-মা এবং বন্ধুবান্ধবদের কিংবা বড় হয়ে স্বামী-সন্তানদের মায়া-মমতা বিলিয়ে দিই। ভালোবাসা দেখাতে পছন্দ করি আমরা। চাই যত্ন নিতে, সান্ত্বনা দিতে। এটাই বেশির ভাগ নারীর প্রাকৃতিক, সহজাত প্রবণতা। সুতরাং নারীর প্রকৃত জায়গা হলো তার পরিবারে। তিনি চান তার পারিবারিক জীবনকে গড়তে, সাজাতে ও লালন করতে।

বাড়ির কাজ করা খুব সহজ, এমনটা বলিনি। এটাও কঠিন ও ক্লান্তিকর হতে পারে। এটা একটা ফুলটাইম জব। তবে অতটুকুই। এর বেশি আর কোনো দায়িত্ব নারীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়নি ইসলাম।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

**“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কী করে জানবেন না? তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদা জ্ঞাত।”[৩১]**

আর নারীবাদের জেদ হলো যে, নারীরাও বাড়ির বাইরে কাজ করবে, বিরাট ক্যারিয়ার গড়বে। কোনো পুরুষের ওপর নির্ভর না করেই নিজে অর্থোপার্জন করবে। পুরুষতন্ত্রকে শেষ করে দাও!

তবে মানবপ্রকৃতি তো মানবপ্রকৃতিই। বেশির ভাগ নারীই তাদের লালনপালনের প্রবণতা বা গৃহকর্ত্রী হিসেবে ভূমিকা রাখার ইচ্ছাকে ছাড়তে পারে না। তাই আধুনিক নারীরা করার চেষ্টা করে উভয়টিই। একদিকে ক্যারিয়ার গড়া, ক্ষমতালাভ, স্বাধীন হওয়ার মতো নারীবাদী মন্ত্রও গলাধঃকরণ করে। আবার অন্যদিকে বিয়ে, পরিবার ও মাতৃত্বের প্রতি সহজাত আকর্ষণও একেবারে ত্যাগ করতে পারে না।

---

[৩১] সূরা আল-মুলক, ১৪

এভাবে নারীবাদ নারীদের ওপর দাসত্ব ও অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়। মুক্ত করা তো দূরের কথা। এরই চাপে পিষ্ট হয়ে নিজেকে একেবারে শূন্য, রিক্ত করে ফেলছেন আধুনিকারা।

তাই মুসলিম নারী হিসেবে একটু চিন্তাভাবনা করুন। আমাদের সবচেয়ে বেশি জানেন আমাদের রব। তাঁর নির্ধারিত পরিসীমা অস্বীকার করার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে শুধু দুর্দশাই ডেকে আনছি।

# আদর ও শাসন

-উম্মে খালিদ

কয়েক বছর আগের কথা। এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখা একটা ঘটনা এখনো আমার মনে গেঁথে আছে। তখনই সিদ্ধান্ত নিই আমার সন্তানদের জন্য প্যারেন্টিং রুলস ঠিক করব।

আমার বড় ছেলের বয়স তখন দুই বছর। এদিকে গর্ভে তখন দ্বিতীয় সন্তান। আত্মীয়ার সাথে সোফায় বসে ছিলাম। তার ১৯ বছর বয়সের ছেলেটা নিজের বেডরুম থেকে বের হয়ে লিভিংরুম দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সে একবারও আমাদের কারও দিকে তাকায়নি। সালাম পর্যন্ত দেয়নি।

ছেলেকে উদ্দেশ্য করে মা বললেন, "আসসালামু আলাইকুম, আব্বু। তুমি আবার বাইরে যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ এখন?"

ছেলেটা কোনো সাড়া দিল না। এমনকি পেছনেও তাকাল না একনজর।

"আচ্ছা, বাজে বন্ধুদের সাথে কোথাও যেয়ো না। কার সাথে দেখা করতে যাচ্ছ? তাড়াতাড়ি বাসায় এসো, ঠিক আছে?"

ছেলেটা দরজা খুলে তখন বেরিয়েই যাচ্ছে প্রায়।

"জিমে যাবা? নাকি বন্ধুদের সাথে ঘুরতে? ওই মেয়ের সাথে কথা বলবা নাকি আবার? দেখো, কোনো মেয়ে-টেয়ের ধারে-কাছেও যেয়ো না, ঠিক আছে?"

ছেলেটা বেরিয়ে গেল। পেছন থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে।

ছেলে চলে যাওয়ার পর মা নিজেই নিজেকে জবাব দিলেন, "ঠিক আছে।"

এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম সেখানে। প্রায় ২০ বছর বয়সি ছেলেটা একবারও মায়ের দিকে ফিরে তাকাল না। কোনো জবাবই দিল না তার কথার।

সে না অন্ধ, না বধির। মায়ের কোনো গুরুত্বই নেই তার কাছে।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো এই মা তার ছেলের জন্য জানপ্রাণ এক করে দিচ্ছেন। মাথার ওপর তুলে রাখছেন তাকে। অথচ এই বিশ বছর বয়সি ছেলে তাকে পাত্তাও দিচ্ছে না। কথার উত্তর দেওয়া বা তাকানো তো দূরে থাক। মায়ের অবস্থান তার কাছে সবার শেষে।

আসলে কী জানেন? সন্তানকে এত প্রশ্রয় দেয়া মোটেও উচিত না। এতে বাচ্চারা বখে যায়। নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। আপনার দুনিয়া হয়তো তাদের ঘিরে। কিন্তু তাদের দুনিয়ার কেন্দ্র তারা নিজেরাই। আপনার কোনো কাজে আসবে না এসব সন্তান।

সেদিনই আমার নিজের ছেলেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিলাম। যখনই আমি তাকে কোনো আদেশ করব বা কিছু জিজ্ঞেস করব, সে যেন আমাকে সাথে সাথে 'জি, আম্মু' বলে। প্রায়ই আমার বাচ্চাদের বলি, "আমি তোমাদের মা। তোমরা আমার সন্তান। আমি তোমাদের কোনো কাজের আদেশ দিলে তোমাদের সেটা মানতে হবে।"

জানি, কথাটা শুনতে বেশ কঠোর মনে হচ্ছে। কিন্তু এটাই নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা। আপনার প্রত্যাশা ও অবস্থান স্পষ্ট করে বলতে হবে। রাখা যাবে না কোনো অস্পষ্টতা, কোনো সংশয়। সন্তানদের প্রতি আমার প্রত্যাশা খুবই স্পষ্ট। ফলে তা ওদের জন্যও মেনে চলা সহজ। বাচ্চাদের জানা আছে, তাদের কী করতে হবে।

ফ্যামিলি সাইকোলজিস্ট ও চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্ট জন রোজমন্ড তার একটি বইয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।

ভালোবাসা সহকারেই শাসন করতে হবে। ঠিক যেমন দয়া ও ন্যায়বিচার হাত ধরাধরি করে চলে।

একেবারেই শাসন না করে অতিরিক্ত ভালোবাসা দিলে সন্তান পথভ্রষ্ট হয়। এই পথভ্রষ্ট ছেলে-মেয়েরা বাবা-মায়ের ভালোবাসাকেও অবহেলা করে। আবার ভালোবাসা ছাড়া অতিরিক্ত শাসন করলে সন্তান নিজেকে ভাবে উপেক্ষিত, অবহেলিত। এগুলোর কোনোটাই ভালো নয়।

তিন ধরনের প্যারেন্টিং দেখতে পাই আমরা।

- অতি-কঠোর বাবা-মা : তারা সন্তানকে আদেশ দেন। কোনো প্রশ্ন সহ্য করেন

না। মত প্রকাশের সুযোগও দেন না সন্তানকে। বিবেচনায় নিতে আগ্রহী নন সন্তানের পছন্দ-অপছন্দ। সবকিছুতেই তাদের 'না'। সন্তানের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ নিতান্তই অল্প।

➡ ভারসাম্য রক্ষাকারী বাবা-মা : তারা সন্তানকে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেন। সন্তানের সমস্যা সমাধানে সব সময় যত্নশীল। সন্তানের প্রশ্নকে উদার মনে গ্রহণ করেন। গুরুত্ব দেন সন্তানের পছন্দ-অপছন্দকে। ছেলে-মেয়ের শারীরিক ও মানসিক চাহিদাকে বোঝেন। ভারসাম্য বজায় রাখেন ভালোবাসা, নিয়মানুবর্তিতা, দয়া ও সুবিচারের মধ্যে।

➡ অতি-কোমল বাবা-মা : নিয়মানুবর্তিতা শেখানোর পরিবর্তে তারা সন্তানের স্বাদ-আহ্লাদকে গুরুত্ব দেন। বাচ্চারা যখন যা চায়, তা-ই দিয়ে দেন। অতিরিক্ত লাই দিয়ে রাখেন তাদের। একটুও শাসন করেন না তারা।

মুসলিম মা-বাবা হিসেবে আমাদের লক্ষ্য থাকবে সন্তান ও পরিবারের ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করা। হতে পারে আমাদের নিজেদের বাবা-মা আমাদের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করেননি। কিন্তু এই দুষ্টচক্রকে এখানেই থামিয়ে দেব আমরা।

# সন্তানের কুরআন হিফয

-উম্মে খালিদ

চার থেকে পাঁচ বছর বয়সি বাচ্চাদের কীভাবে আল-কুরআন হিফয করা শেখাবেন, এ নিয়ে অনেক মা-ই আমার কাছে টিপস চান। মায়েদের অভিযোগ, "বাচ্চা পড়তে চায় না। বলে, ক্লান্ত লাগছে। আবার কখনো না পড়ে খেলতে চায়।"

সন্তানদের ছোট থেকেই কুরআন শিক্ষা দেওয়া খুবই ভালো কাজ। কিন্তু কাজটা কীভাবে করব, সেটাই প্রশ্ন।

মনে রাখবেন যে, আপনার বাচ্চা এখনো খুব ছোট। চার-পাঁচ বছর বয়স খুবই অল্প। এই বয়সে বাচ্চারা এত লম্বা সময় ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারে না। কিছুক্ষণ পরই তার হইচই করতে মন চায়। এটাই স্বাভাবিক। তাই সে ক্লান্তবোধ করলে রাগ করবেন না। বুঝতে পারছি আপনার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দৌড়াতে চাওয়া, খেলতে চাওয়া তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের এই পর্যায়ের সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তার সাথে জবরদস্তি না করার পরামর্শ রইল। মারামারি, বকাঝকা করবেন না। এতে আপনি ও বাচ্চা দুজনই বিরক্তি ও ক্লান্তবোধ করবেন। তাকে শেখানো আরও কঠিন হয়ে যাবে পরে। একবসায় অনেকক্ষণ না পড়িয়ে ভিন্ন কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

## ১. খেলাচ্ছলে শেখা

প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করুন। সে ভালো তিলাওয়াত করলে পুরস্কার হিসেবে কিছু দিন। এমনকি একটি স্টিকার বা চকোলেট-জাতীয় কিছু হলেও। পুরস্কারের ছোট-বড় নিয়ে অত মাথা ঘামায় না বাচ্চারা। পেলেই খুশি।

## ২. অর্থ বোঝানো

এই অল্প বয়সেও বাচ্চারা জানতে চায় তারা যা শিখছে, এর অর্থ কী। সহজ ও বয়সোপযোগী কোনো একটি তাফসির থেকে শেখান তাকে। মূল বক্তব্যটা বলুন শুধু।

অর্থ বুঝলে মনে রাখাও সহজ।

## ৩. অডিওর ব্যবহার

যে সূরা শেখাতে চান, সেটার তিলাওয়াত ছেড়ে রাখুন সারাদিন। আপনি বাসার কাজে ব্যস্ত থাকাকালে, কোথাও যাওয়ার সময় গাড়িতে, বাচ্চা ঘুমানোর আগে, বা খেলাধুলাতে ব্যস্ত থাকলেও অডিও বাজিয়ে রাখুন। এই অল্প বয়সে শুধু শুনে শুনেই বাচ্চারা অনেক কিছু শিখে ফেলে। কোথাও গান বাজলে যেভাবে সেটা একেবারে মাথায় আটকে যায়, সেভাবে। কোনো গান ক্রমাগত শুনলে এটা মাথায় আটকে যায়, তাই না? আমরা এই কাজটা করব আল কুরআনের ক্ষেত্রে। সূরা যেন তাদের মাথায় গেঁথে যায়।

নিজের বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও এ-রকম করেছি। প্রত্যাশার চেয়েও ভালো কাজ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। পার্কে যাওয়ার সময় আমার ফোনে সূরা আল-বুরুজ ছেড়ে রেখে দিতাম। কয়েক দিন পর দেখলাম তারা সূরাটি প্রায় অর্ধেক কোনো ভুল ছাড়াই বলতে পারছে। এই সূরার প্রথম অর্ধাংশ নিজেই পড়ে পড়ে শিখিয়েছি তাদের। আর দ্বিতীয়ার্ধ তারা শিখেছে গাড়িতে অডিও শুনে। দ্বিতীয় পদ্ধতিটাই বেশি সহজ।

## ৪. দল-বেঁধে শেখা

বাচ্চার পড়ায় খুব সুন্দর গতি আসবে, যদি সে বাসায় একা কুরআন না শিখে অন্য বাচ্চাদের সাথে শেখে। আরও যেসব বাবা-মা বাচ্চাদের নিয়ে একই সমস্যায় আছেন, খুঁজে বের করুন তাদের। আপনার বাচ্চা অন্যান্য বাচ্চাদের কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখলে বুঝতে পারবে যে, শুধু তাকে একা শিখতে বলা হয় না। অন্যরাও শিখছে। তা ছাড়া দল-বেঁধে কাজ করা আনন্দদায়কও বটে। উৎসাহ হিসেবে কাজ করে এটি।

## ৫. জোর না খাটানো

বাচ্চাকে দ্রুত শেখার জন্য চাপ প্রয়োগ করবেন না। ইনশাআল্লাহ বাচ্চার হিফযের যাত্রা সবে শুরু। আল-কুরআনের সাথে মাত্রই সম্পর্ক শুরু হচ্ছে তার। আমরা চাই এই সম্পর্ক হোক অত্যন্ত মধুর ও চিরস্থায়ী। আল-কুরআনকে তারা ভালোবাসুক। চাপ প্রয়োগ করলে, বকাঝকা করলে সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হবে না। বুদ্ধি খাটিয়ে ও ভালোবাসা দিয়ে করতে হবে এই কাজটা।

অন্তরে আল-কুরআনের জন্য ভালোবাসা তৈরি করতে চাইলে প্রথমে শেখাতে হবে আল-কুরআনের পরিচয় কী। ঠিক যেভাবে এক মানুষের সাথে আরেক মানুষের পরিচয়

করিয়ে দিই, সেভাবে।

বাচ্চাকে বলুন যে, আল-কুরআন হলো স্বয়ং আল্লাহর বাণী। এটি সংরক্ষিত আছে লাওহে মাহফূযে। আল্লাহ ফেরেশতা জিবরাঈল ﷺ এর মাধ্যমে আল-কুরআন পাঠিয়েছেন সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে। তাকে কুরআন শেখানোর জন্য।

হেরা গুহার ঘটনা শোনান তাকে। জিবরাঈল ও রাসূলুল্লাহর প্রথম সাক্ষাৎ, প্রথম সূরা নাযিল, প্রথম শব্দ শেখার চমকপ্রদ ঘটনাগুলো তুলে ধরুন। আরও শোনান কুরআন শেখার ফযিলত। আমার বাচ্চাদেরও প্রায়ই বলি এগুলো। কুরআন কিয়ামতের দিন আমাদের জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করবে। দুনিয়ায় যত কুরআন তিলাওয়াত করব, আখিরাতে মর্যাদা বাড়বে তত বেশি। আমরা এই দুনিয়ার জীবনে কুরআনকে যত বেশি ভালোবাসব, এর ফলস্বরূপ আল-কুরআন আখিরাতের জীবনে আমাদের নাযাতের কারণ হবে। আমাদের পথ আলোকিত করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সহজ করে দেবে আখিরাতের প্রত্যেকটা ঘাঁটি পার হওয়া।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ক্বিয়ামাতের দিন কুরআনের বাহককে বলা হবে, পাঠ করতে থাকো ও ওপরে আরোহণ করতে থাকো। দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে-সুস্থে পাঠ করতে, ঠিক সেরূপে। যে আয়াতে তোমার পাঠ সমাপ্ত হবে সেখানেই তোমার স্থান।"[৩২]

কুরআন হিফযের বৈঠকগুলো সংক্ষিপ্ত ও আনন্দময় করার চেষ্টা করুন। পেটে ক্ষুধা, পানির পিপাসা, ক্লান্তি, ঘুম-ঘুম ভাব ইত্যাদি নিয়ে বসিয়ে রাখবেন না বাচ্চাদের। দিনের একটি উপযুক্ত সময় বেছে নিন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কথার সাথে কাজের মিল। আপনার সন্তান যেন আপনাকেও কুরআন তিলাওয়াত ও হিফয করতে দেখে। বাচ্চারা কথা শোনার চেয়ে কাজ দেখে শেখে অনেক বেশি।

[৩২] আবু দাউদ ১৬৪৬; আত-তিরমিযি, ২৯১৪; সহীহ আবু দাউদে আল-আলবানী সহীহ হিসেবে গণ্য করেছেন।

-উম্মে খালিদ

পিতামাতা হিসেবে সন্তানের প্রতিভা চিনতে পারা খুবই জরুরি। কিসে তারা ভালো, কোন কাজে পারদর্শী।

কিছুদিন আগে পার্কে গিয়েছিলাম বাচ্চাদের নিয়ে। বাচ্চারা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দৌড়াদৌড়ি করছিল। খেলার জিনিসপত্রে ঝুলছিল। আমি বসে ছিলাম প্লে-গ্রাউন্ডের পাশে কাঠের বেঞ্চে।

এমন সময় ছোট্ট নাতিকে নিয়ে সেখানে এলেন পাকা চুলের এক দাদু। বাচ্চাটা খালিদের বয়সি। সেই দাদা আমার মেজো ছেলের দিকে তাকালেন। আমার ছেলে তখন একটা খাড়া দড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে ব্যস্ত। সে যখন নিজেকে দড়িটির একেবারে শীর্ষে টেনে নিয়ে গেল, তখন বৃদ্ধটি বেশ অবাক হলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার ছেলে? দারুণ শক্তিশালী তো! খুব শক্তিশালী! আপনি জানেন এ রকম দড়ি বেয়ে উঠতে শরীরের ওপরের দিকে কত শক্তি লাগে? সে প্রচণ্ড শক্তিশালী ছেলে! তার বয়স কত?"

"ছয়।" তার কথায় ভীষণ আগ্রহ দেখে খানিকটা অবাক হয়ে বললাম।

"আচ্ছা, সবল বাচ্চা। এই শক্তি ওর প্রতিভা। একটা উপহার। প্রতিটি বাচ্চার আলাদা আলাদা প্রতিভা আছে। এগুলো জেনে রাখা উচিত। সন্তান যে কাজে দক্ষ, সেটা করতে উৎসাহিত করতে পারবেন তাহলে। এই প্রতিভাগুলো তারা আপনার থেকেও পায় না, নিজের থেকেও না। এগুলো দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা।" বৃদ্ধ লোকটি বললেন।

"জি স্যার," আমি বললাম। তিনি অমুসলিম। তবে এই কথাগুলো সত্য।

দাদা-নাতি চলে যাওয়ার পরে আমি এই কথাটা নিয়ে ভাবলাম। আগে থেকেই জানতাম যে, আমার একেকটা ছেলের আচরণ, মেজাজ, ব্যক্তিত্ব আরেকটার চেয়ে আলাদা। ওদের সাথে কিছু সময় কাটালে আপনারাও বুঝতেন। সবচেয়ে বড়জন কারও অনুমতি

না নিয়ে নিজে নিজেই কিছু করতে চায়। অন্যদিকে মেজোজন একেবারেই উল্টো। যেকোনো কাজ করার আগে সে অনুমতি চাইবে। বড় ছেলে আগে অনুমতি নেয়ার চেয়ে পরে ক্ষমা চেয়ে নেয়ার সহজ মন্ত্র অনুসরণ করে। আর দ্বিতীয়জন ভাবে ক্ষমা চাওয়ার চেয়ে নিরাপদে থাকা ভালো।

আমি সাধারণত বড়জনকে কিছু করার আগে দরকারে বড়দের অনুমতি নিতে উৎসাহিত করার চেষ্টা করি। আর মেজোটাকে দিই একেবারে ভিন্ন পরামর্শ। তাকে বলি আরও আত্মবিশ্বাসী হতে, দ্বিধা করতে না।

তৃতীয় ছেলেটা শান্ত ও সৃজনশীল। আমরা মাঝেমধ্যে পেইন্টিং ক্লাসে যাই। তখন আশ্চর্যরকম শৈল্পিক এবং কল্পনাপ্রবণতা প্রকাশ করে সে। মা হিসেবে তার চার বছর বয়সের প্রচেষ্টা দেখে অবাক হই আমি। আবার সে-ই তার মেজাজের ওপর নির্ভর করে তার ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু হতে পারে।

আমার ছোট ছেলের মাত্র আড়াই বছর বয়স। এখনই তার বড় তিন ভাইয়ের চেয়ে বেশি গোঁয়ার এবং জেদি। আল্লাহ্ তাকে সত্যের ওপর জেদি ও দৃঢ় করুন, আমীন!

এখন থেকে আরও গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করব তাদের শক্তি ও দুর্বলতাগুলো। তাদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক, তাদের প্রয়োজন ও ভালোবাসার ভাষা পর্যবেক্ষণ করব। প্রতিটি শিশুর রয়েছে এমন প্রতিভা, যা মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে আবিষ্কার করা সম্ভব। সম্ভব সেগুলোর বিকাশে পরিচর্যা। সর্বোপরি, ভালো কাজে সেগুলো ব্যবহার করা।

এসব প্রতিভার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আপনার প্রতিটি সন্তানকে কী উপহার দিয়েছেন তা জানা জরুরি। এর জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করুন এবং তাঁর জন্যই এই প্রতিভাগুলো ব্যবহার করুন।

# সন্তান-পাহারা

-শাইখ ইউনূস কাথরাদা

মাঝেমধ্যে মনে হয় দুনিয়াটা উল্টে গেছে। মানুষ হারিয়েছে তার নৈতিকতা। সঠিকটা এখন ভুল এবং ভুলটা সঠিক। এখন সন্তান প্রতিপালনের যথাযথ গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। বাচ্চাদের লালনপালন করা একটি বিশাল দায়িত্ব। সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে, আমাদের আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

কিছু বিষয় জেনে রাখুন।

• বিয়ের আগে মনে রাখবেন যে, আপনার স্বামী/স্ত্রী হলো আপনার সন্তানের বাবা/মা। তাই উত্তমরূপে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করুন।

• জীবনের প্রতিটি ধাপে দুআর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনসঙ্গী বাছাই করার আগে, ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগে, গর্ভাবস্থায় এবং সন্তানের সারাটা জীবনজুড়ে দুআ করতে থাকুন।

• সন্তানদের জন্য ঘরে একটি উত্তম পরিবেশ নিশ্চিত করুন।

• সন্তানদের অন্তরে ইসলামী মূল্যবোধের পরিচর্যা করবেন একদম অল্প বয়স থেকেই। 'এখনো তো ছোট' এ রকম ভাববেন না।

• পার্থিব বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশিক্ষণ যেভাবে দেন, ঠিক সে রকম গুরুত্বের সাথেই তাদের শেখান বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা। বন্ধুত্বের পুরো ধারণাটি নিয়ে কথা বলুন তাদের সাথে।

• সন্তানেরা বাইরে বা টিভিতে কিংবা স্কুলের বইয়ে যা দেখছে, তা নিয়ে কথা বলুন। সেখানে এমন পরিবারের ছবি বা আলোচনা থাকতে পারে, যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। ধরে ধরে দেখিয়ে দিন এগুলোর অসারতা ও সঠিক ইসলামী

বিকল্প। এ পার্থক্যগুলো তারা নিজের মতো বুঝে নেবে না। আপনাকেই পালন করতে হবে প্রহরীর ভূমিকা।

• ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের অন্তরে প্রোথিত করে দিন যে, ঠিক-বেঠিক ও নৈতিক-অনৈতিকের মানদণ্ড ইসলাম। মানুষ ও সমাজ কী বলে সেটা নয়।

• ইসলামী ঐতিহ্যবাহী পরিবারের ধারণাটি ভালো করে বুঝিয়ে দিন তাদের। স্পষ্টভাবে তাদের বোঝান যে, এটিই ইসলামে বৈধ বলে স্বীকৃত একমাত্র পরিবারব্যবস্থা।

• জোরপূর্বক যৌন সহিংসতা থেকে যে সন্তানদের রক্ষা করতে হবে, তা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিকৃত যৌনাচারের কিছু আহ্বান আদতে জোরপূর্বক নয়, সম্মতিমূলক। মগজধোলাইয়ের মাধ্যমে তারা এই সম্মতি আদায় করে নিতে চায়। যেমন : বিয়ে-বহির্ভূত প্রেম কিংবা সমকামিতা। এগুলোর ব্যাপারে সন্তানকে বয়সোপযোগী করে জানান ও সাবধান করুন। কারণ, বাইরে, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এগুলোর ব্যাপারে একদম ছোট বয়স থেকে মগজধোলাই করা হয়। পরিস্থিতিভেদে আমাদের প্রতিক্রিয়া বিভিন্নরকম হবে। তবে মোটকথা, এগুলো ইসলামে অনৈতিক, কিছুক্ষেত্রে জঘন্য ও অস্বাভাবিক। যারা এসব বিষয় স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা করে, তাদের কথাও শুনতে দেওয়া যাবে না সন্তানদের।

• মিত্র এবং শুভাকাঙ্ক্ষী এক জিনিস না। এ ব্যাপারটি অবশ্যই বাচ্চাদের শেখানো উচিত। এখানেই আল-ওয়ালা ওয়াল বারার (ইসলামের ভিত্তিতে মিত্রতা-শত্রুতা) ধারণাটা আসবে।

• বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাল্পনিক জগতে অবস্থান করা কখনোই সম্ভব নয়। যখন যে সমাজব্যবস্থায় অবস্থান করছি, সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি অনুচিত গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে গিয়ে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলা। সমাজ যদি ইসলামের প্রতিকূল হয়, তাহলে বিচ্ছিন্নতা ও অন্ধ অনুসরণের মধ্যকার সঠিক পথটি হাতে-কলমে শেখান সন্তানদের।

• সমস্যা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা অনুচিত। সম্ভাব্য বিপদের জন্য আগে থেকে প্রস্তুত থাকুন এবং সন্তানদেরও সেভাবে প্রস্তুত করুন।

# কওমে-লূতের পুনরুত্থান

-উম্মে খালিদ

ইউটিউবে অনেক "বিউটি গুরু" আছে, যারা মেকআপ, হেয়ার স্টাইলিং, বিউটি এক্সেসরিজ ও ফ্যাশন সম্পর্কে ভিডিও পোস্ট করে।

ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিশোরী-তরুণীকে চিনি, যারা এসব মেকআপ টিউটোরিয়াল দেখে। অনুসরণ করে তাদের প্রিয় বিউটি গুরুকে। ছেলেমেয়েরা যে এই বিউটি গুরুদের কাছ থেকে শুধু মেকআপ করাই শিখছে তা নয়। তারা এসব ইনফ্লুয়েন্সারদের লাইফস্টাইলের প্রতিও মুগ্ধ।

কৌতূহলবশত ইউটিউবে সেরা ১০ বিউটি চ্যানেল সন্ধান করলাম। দেখি তো কোন মেয়েটা সবচেয়ে জনপ্রিয় বিউটি এক্সপার্ট। গ্রাহকসংখ্যাই-বা কত তার।

রীতিমতো চমকে উঠলাম আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে। সেরা দশ বিউটি ইউটিউবারের মধ্যে পাঁচ জনই পুরুষ। সমকামী পুরুষ!

একজনের বাবা তার ৬ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে। তার সিংগেল মা বড় করে তাকে। মা ছিল একজন মডেল।

আরেকজনের সর্বাধিক জনপ্রিয় ভিডিওর বিষয় হলো তার প্রথম যৌনসংগমের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে।

আরেকজনের বিরুদ্ধে বিকৃত আচরণ এবং তরুণ ছেলেদের সমকামী সম্পর্ক স্থাপনে প্ররোচিত করার অভিযোগ আছে।

এই লোকগুলোকে সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার বলার কারণ আছে। তারা শুধু মেকআপ শেখায় না। তারা তাদের হারাম, চটকদার লাইফস্টাইলও শেখায়। ছেলেমেয়েদের জীবন সম্পর্কে নানা পরামর্শ দেয় তারা। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের গল্প প্রকাশ করে, অন্যদেরও প্ররোচিত করে ও-রকম হতে। তারা অস্বাভাবিক আচরণকে স্বাভাবিক করে

তোলে। গুরুতর পাপের দিকে ধাবিত করে তরুণ প্রজন্মকে।

কীভাবে আমরা আমাদের বাচ্চাদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করব?

নিয়মিত তাদের সাথে কথা বলে। সত্যিকার অর্থেই তাদের কাছের মানুষ হয়ে। ছেলেমেয়েরা কোন ধরনের জিনিস দেখছে বা পড়ছে, তক্কে তক্কে থাকতে হবে সে ব্যাপারে। তাদের অনলাইন কন্টেন্ট দেখার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে।

LGBTQ ইস্যু নিয়ে সরাসরি বোঝাতে হবে আমাদের সন্তানদের। শত্রুকে যেহেতু চিনেছি, সেহেতু অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আমরা জানি কীভাবে সমকামিতাকে গ্ল্যামারাইজ করা হয়, কীভাবে কালচারাল ট্রেন্ড এই সমকামী ইনফ্লুয়েন্সারদের সমর্থন করে। আমাদের সন্তানদের দেখাতে হবে যে, আল্লাহ এই লাইফস্টাইল সম্পর্কে কী বলেছেন।

বাচ্চাদের লূত আলাইহিস সালামের ঘটনা শোনান। তিনি তাঁর জাতির কাছে আল্লাহ-প্রেরিত একজন নবী। ঠিক একই জঘন্য পাপে লিপ্ত ছিল সে জাতি—সমকামিতা!

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

**“তোমরা নারীর পরিবর্তে পুরুষদের দ্বারা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করছ। তোমরা তো আসলেই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।”[৩৩]**

হতে পারে আপনার সন্তান খুব ছোট। যৌনাকর্ষণের ব্যাপারটা এখনো বোঝে না সে। তখন? ওদিকে দুর্বৃত্তরা ওঁত পেতে আছে নিজেদের ধ্যান-ধারণার বিষ তার কানে ঢালতে। কিন্তু মুসলিম বাবা-মা হিসেবে আপনি সেটার মোকাবিলা করবেন কী করে? বিয়ের ধারণাটি ব্যবহার করুন। বাচ্চারা সহজাতভাবেই জানে বিয়ে হয় একজন পুরুষ এবং একজন নারীর মাঝে। এখানে একজন আম্মু থাকে, আরেকজন থাকে আব্বু। এটার সাথে সমকামিতার বৈপরীত্য দেখালেই শিউরে উঠবে তারা।

লূত আলাইহিস সালাম এই ভয়াবহ পাপ বন্ধ করতে বললে লোকেরা উপেক্ষা করে। উপহাস করে তাকে নিয়ে, দেশছাড়া করার হুমকি দেয়। এমনকি লূত আলাইহিস সালামের কাছে মানুষের রূপ ধরে আসা ফেরেশতাদেরও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে তারা! পাপের ওপর পাপ, তার ওপরে পাপ!

তাই আল্লাহ তাদের পুরো শহর ধ্বংস করে দিলেন। পুরো শহরকে উল্টিয়ে দিলেন।

[৩৩] সূরা আল-আরাফ, ৮১

ধ্বংসস্তূপ ছাড়া অবশিষ্ট রইল না আর কিছুই।

শহর ধ্বংস হওয়ার আগে আল্লাহ নবী লূত আলাইহিস সালামকে তার পরিবার নিয়ে চলে যাওয়ার আদেশ করলেন। তারা রক্ষা পান এতে। কিন্তু সবাই না। লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রীও ধ্বংস হয়ে যায় ওই জাতির সাথে।

কেন? সেও কি সমকামী ছিল? না। সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে পেছনে ফিরে তাকায়। পাপাচারী জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল সে। তাই সেও একই শাস্তি ভোগ করে।

তার মানে এখানে দুটি পাপ রয়েছে :

১. সমকামিতা

২. সমকামিতাকে অপছন্দ না করা, পাপ মনে না করা, এ কাজ করার অধিকার সমর্থন করা।

দুটোই পাপ। দুটোই!

দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক পৃথিবীতে মুসলিমরাও এ নিয়ে ধোঁকায় পড়ে আছে। অনেক জনপ্রিয় মুসলমানও বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, সমকামিতায় লিপ্ত হওয়াই শুধু গুনাহ নয়। এটার স্বাভাবিকীকরণ, স্বীকৃতি প্রদান বা এ পাপ সম্পর্কে নীরব থাকাও গুনাহ।

কিছু জনপ্রিয় মুসলিম রাজনীতিবিদ ও কর্মী ট্রান্সজেন্ডারদের সাথে নাচে, গে-প্রাইড র‍্যালিতে অংশ নেয়। মুসলিমদের বলে এসব সমর্থন করতে। কিছু ইসলামী ইন্সটিটিউট লম্বা রচনা লিখে বোঝাতে চায় যে, কেন মুসলিমদের 'কিছু কিছু' LGBTQ অধিকারের সাথে গলা মেলানো উচিত। কিছু জনপ্রিয় মুসলিম বক্তা মুসলিমদের LGBTQ অ্যাক্টিভিস্টদের সাথে একসাথে কাজ করতে উৎসাহিত করে।

আপনার সন্তানকে এসব থেকে বাঁচান। দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই।

# স্ক্রিন-আসক্তির ১০ প্রতিকার

-উম্মে খালিদ

গতকাল একজন বোন আমাকে বললেন তার ৭ বছর বয়সি ছোটবোনের কথা। সে সারাদিন টিভিতে কার্টুন দেখে। তার বাবা-মায়ের বয়স ৬০ এবং ৫০ এর কোঠায়। তারা চাকরি করেন। বেশির ভাগ সময় থাকেন বাসার বাইরে। তার সাথে কাটানোর জন্য যথেষ্ট সময় নেই তাদের হাতে। তাই সে টিভি দেখে সময় কাটায়।

তিনি ছোটবোনকে নিয়ে ছিলেন বেশ চিন্তিত। জিজ্ঞেস করলেন, "কীভাবে এই সমস্যা সামাল দেব? প্রায় সব জায়গাতেই এই সমস্যাটা দেখছি।"

বাচ্চাদের স্ক্রিনটাইম না দিলে এর পরিবর্তে অন্য কিছু তো দেওয়াই লাগবে। কিন্তু সেটা কী? বর্তমানে অনেক বাবা-মায়ের মনের প্রশ্ন এটি।

সমস্যা হলো, বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে ফেলেছে। শুধু বিনোদনের উদ্দেশ্যেই টেকনোলজিক্যাল ডিভাইসগুলোতে রয়েছে অনেক ব্যবস্থা। আমরা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে অভ্যস্ত। সেটা টিভি, ল্যাপটপ, আইপ্যাড, স্মার্টফোন যা-ই হোক।

বিশেষ করে কখনো কখনো ক্লান্ত বাবা-মায়েরা সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে স্ক্রিনের দ্বারস্থ হন। বাচ্চাদের মোবাইল-ল্যাপটপ দিয়ে শান্ত করে নিজেরা বিশ্রাম বা অন্য কাজে মন দেন।

ছোটবেলায় আমার টিভি দেখার অনুমতি ছিল না। আর স্মার্টফোন, আইপ্যাড বা ল্যাপটপ তো তখন আসেইনি। অন্তত মিসরে। তাই আমি স্ক্রিন ছাড়াই বড় হয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ।

আমার চাচা-চাচি এবং আত্মীয়-স্বজনসহ যারা আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন, তাদের সকলের বসার ঘরে টিভি ছিল। প্রতিবার যখন কাজিনদের সাথে সময় কাটাতে যেতাম, আমি দেখতাম টিভিতে মিসরীয় সিরিজ, ফুটবল ম্যাচ বা নিউজ দেখছে তারা।

একদিন বেশ ভাবিয়ে তুলল বিষয়টা। সবার টিভি আছে, আমাদের নেই! বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আব্বু, আমাদের টিভি নেই কেন?"

"আছে তো! আলমারিতে।" বাবা বললেন।

আট বছর বয়সি আমি কথাটা শুনে বঞ্চিত শিশুর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। বললাম, "তাহলে চালাই না যে?"

এই প্রশ্নের উত্তরে বাবার সুন্দর জবাবটা আজ কয়েক দশক পরেও আমার মনে গেঁথে আছে। তিনি বললেন, "কারণ আমরা আমাদের মনকে কলুষিত করতে চাই না। আমাদের মন-মানসিকতাকে পরিষ্কার রাখতে চাই। নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রস্ফুটিত করতে চাই। টিভি আমাদের এমন জিনিস শেখায়, যা সঠিক নয়। ভালো নয় মোটেও।"

জিজ্ঞেস করলাম, "যেমন?"

তিনি জবাব দিলেন, "অনেক কিছু। যেমন, নাটকে নেতিবাচক বার্তা আছে। এগুলো হারাম এবং ইসলামবিরোধী। মানুষকে ভালো জিনিস শেখানোর পরিবর্তে খারাপ জিনিস শেখায়। এমনকি বাচ্চাদের কার্টুনও এই কাজটা করে। টিভি-শোগুলো ফাসাদের কারণ। এটি তিলফিযইয়ুন (টেলিভিশন) নয়, এটি মুফসিদুন (ফাসাদ সৃষ্টিকারী)।"

তার উত্তর শুনে আমি হেসে দিলাম। বাবার কথার সত্যতা নিয়ে তর্ক করিনি। কাজিনদের বাসায় টিভিতে প্রচুর পরিমাণে এসব জিনিস দেখেছি। তাই জানতাম কথাটা সত্য।

তবে আমার তখনো আরও একটি প্রশ্ন ছিল। "তাহলে নিউজ? এটাতে তো হারাম জিনিস নেই, তাই না?"

বাবা বললেন, "এখানে নারী সংবাদপাঠিকা আছে। তারা হিজাব পরে না। এটা ভালো জিনিস নয়। রেডিও থেকে শুনলেই হয়।"

আমি সেই ৮ বছর বয়সেও বাবার যুক্তিতে সন্তুষ্ট হই। টিভির সাথে খুব একটা সংযুক্ত ছিলাম না কখনোই। যেহেতু আমি এটির সাথে বড় হইনি। এর জন্য কোনো টান বা প্রয়োজনও ছিল না। বাবার ব্যাখ্যাটা আমার কাছে ভালো লাগল। চলে গেলাম ভাইবোনদের সাথে খেলতে।

তবে এখন আমি নিজে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও অভিভাবক হিসেবে এই ঘটনাটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি। বাবার জ্ঞান ও শৃঙ্খলাবোধের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

আমার বাবার সেই সময় তিন জন উঠতি বয়সি মেয়ে ছিল। নিউজের বেপর্দা মহিলাদের মতো আপাত ছোট ও সাধারণ কিছুও তার সতর্কদৃষ্টি এড়ায়নি। এসব তার মেয়েদের মানসিকতা ও চাহিদাকে প্রভাবিত করতে পারত।

টিভির অভ্যন্তরীণ-বাহ্যিক দু-রকমেরই সূক্ষ্ম প্রভাব আছে। টিভি খুব আনন্দদায়ক। সময় কাটে। বিনোদনের মাধ্যম। তবে সেই সাথে তা দর্শকদের নির্দিষ্ট কিছু চিন্তাভাবনা দিয়ে প্রভাবিত করে। অভ্যস্ত করায় নির্দিষ্ট ট্রেন্ডের সাথে। টিভিকে ইচ্ছাকৃতভাবেই এভাবে প্রোগ্রামিং করা হয়েছে।

সন্তানকে টিভির পরিবর্তে কোন জিনিসগুলো দিতে পারেন, তার একটি তালিকা এখানে দিলাম। এর মধ্যে একেকটা হয়তো একেকজনের বেলায় খাটবে। আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য যা কার্যকর, তা-ই বাছাই করুন। নিজে থেকে বের করে নিন আরও সৃজনশীল কিছু বিকল্প।

**১. আল-কুরআন :** ছোটবেলায় আমরা বাবার সাথে কুরআন মুখস্থ করতাম। এটা ছিল প্রায় নিত্যদিনের কার্যকলাপ। টিভির না??? প্রচুর সময় পেতাম কুরআন মুখস্থ করার জন্য। মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা সসীম। তাই স্ক্রিন ও কুরআনের প্রতিযোগিতায় কুরআনকে বেছে নিন।

**২. আউটডোর গেমস :** আমরা ছোট বাচ্চা হিসেবে বাইরে প্রচুর খেলাধুলা করেছি। তেমন বড়সড় কিছু না। কোনো ফুটবল লীগ, সামার ক্যাম্প বা কোনো প্রোগ্রাম নয়। শুধুই উন্মুক্ত প্রান্তরে দৌড়েছি, লাঠি দিয়ে ঘাসে খেলেছি, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছি। এটা বাচ্চাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে উপকারী। বিজ্ঞানও এখন এটা প্রমাণ করেছে।

উঠোনে নানান রকমের খেলাধুলা করেছি আমরা। দৌড়াদৌড়ি, লাফানো, বাউন্সিং, স্পিনিং, বল লাথি মারা, কো-অর্ডিনেশন, ব্যালেন্স, সেল্ফ মুভমেন্ট ইত্যাদি। এগুলো পেশির শক্তি বাড়ায়।

**৩. উঁচু স্বরে পড়া :** গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তানের সামনে উঁচু স্বরে পড়ার অনেক কগনিটিভ, ইমোশনাল ও সাইকোলজিক্যাল সুবিধা আছে। এমনকি দিনে ১০ মিনিটেরও কম সময় উঁচু স্বরে পড়লে বাচ্চাদের শব্দগঠন ও অন্যান্য দক্ষতা বাড়ে। গল্প বলাও বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের বন্ধন ও ভালোবাসাকে দৃঢ় করে।

**৪. কথোপকথন :** ছোটবেলায় আমার বাবা আমাদের সাথে প্রচুর কথা বলতেন,

আলহামদুলিল্লাহ। আমিও আমার নিজের বাচ্চাদের সাথে এটা করার চেষ্টা করি। বাবার সাথে বসে সবকিছু নিয়ে কথা বলা আমার কাছে ছিল খুবই মূল্যবান। চারপাশের দুনিয়াকে পর্যবেক্ষণ করতাম। তারপর যেসব আমার শিশুমনকে মুগ্ধ করে, সেগুলো নিয়ে কথা বলতাম বাবার সাথে। এখনো সেই সময়ের দিকে ফিরে তাকালে বুঝতে পারি আমার বেচারা বাবা কতটা সহনশীল ছিলেন। আমার শত বকবকানি ও কৌতূহলেও বাবা এতটুকু অধৈর্য হননি।

একবার খালা আমাকে বললেন, "এখন যাও, খেলো। আব্বুকে বিশ্রাম দাও।"

জবাবে বাবা বলেছিলেন, "না, না। প্রশ্ন করুক। নাহলে ওর মনে খচখচানি থেকে যাবে। অন্য কোথাও গিয়ে খুঁজবে উত্তর। এর চেয়ে ভালো আমাকেই প্রশ্ন করুক।"

এখন নিজের চারটি বাচ্চা সামাল দিতে গিয়ে প্রায়ই বাবার কথাগুলো স্মরণ করি। বাচ্চারা প্রচুর প্রশ্ন করে। আমি বাচ্চাদের সাথে কথা বলি আর মনে মনে বাবার জন্য দুআ করি। বাচ্চাদের প্রশ্ন আসলে শেষই হতে চায় না।

**৫. রং করা :** এটা খুব সহজ একটি আত্মোন্নয়নমূলক কাজ। বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের জন্য। ব্যস্ত রাখার পাশাপাশি এটি তাদের আনন্দ দেয়, শেখায়। পেশিচালনা বাড়ায়। হাত ও চোখের সমন্বিত ব্যবহার করতে সহায়তা করে।

**৬. পাজল :** এটা আরেকটি সহজ এবং আত্মোন্নয়নমূলক কাজ। সাধারণত পাজল খুবই পছন্দ করে বাচ্চারা। উপভোগ করে পাজল মেলানোর চ্যালেঞ্জ। প্রথমদিকে খুব অল্পবয়স্ক শিশুরা হতাশ হয়ে যেতে পারে মেলাতে না পারলে। তবে চর্চার মাধ্যমে বেশির ভাগ বাচ্চা দ্রুত শেখে এবং পারদর্শী হয়ে যায়। এই সাফল্যের অনুভূতিটা খুবই স্বাস্থ্যকর।

**৭. বই পড়া :** বই পড়া বাচ্চাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইফ স্কিল। অবশ্য একদম অনুপযুক্ত বয়সে পড়ার জন্য চাপ দেওয়ার দরকার নেই। এতে উলটো পড়ার প্রতি, শেখার তাদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আগ্রহ দেখালে তারা নিজেরাই পড়া শিখতে শুরু করবে। টিভি ও স্ক্রিনের পরিবর্তে বই পড়া একটি সুন্দর বিকল্প। বই পড়ার মাধ্যমে কল্পনাশক্তি তৈরি হয় ও সৃজনশীলতা বাড়ে। পৃষ্ঠার শব্দের সাথে সাথে শিশুরা মনে মনে ছবি আঁকতে শুরু করে নিজের মতো। অন্যদিকে টিভিতে এটা হয় না। পড়া যেমন শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করে, তেমনি জোরদার করে বোধশক্তি।

**৮. বই লেখা :** কিছুটা বড় হয়ে গেলে আমরা ভাইবোনরা নিজেরাই নিজের 'বই'

লিখতাম। পড়তে ভালোবাসলে লেখার আগ্রহ আপনা থেকেই তৈরি হয়। আমরা আলাদা আলাদা কাগজ স্ট্যাপল করে বইয়ে রূপ দিতাম। নিজে নিজে গল্প বানাতাম, লিখতাম। সাথে আঁকতাম ছবি।

**৯. খেলাধুলা :** বাচ্চাকে মজাদার শারীরিক কসরতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। অল্প বয়স থেকেই এসব ভালোবাসে তারা। উপযুক্ত বয়সে এলেই তাদের সাঁতার, নিক্ষেপ, সাইকেল চালানো, এমনকি ঘোড়ার পিঠে চড়াও শেখাতে পারেন। এগুলো সুন্নাহসম্মত শারীরিক কার্যকলাপ। এ ছাড়া অন্যান্য খেলাধুলাও আছে। বসে বসে টিভি দেখা স্থূলতাসহ অনেক স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণ।

**১০. একঘেয়েমি, কল্পনা ও বিনোদন :** একঘেয়েমি মোটেও আনন্দদায়ক না। তবে কখনো কখনো এটাও বেশ কাজের। যেহেতু প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জনক। একঘেয়েমি থেকে আমরা ভাইবোনেরা প্রায়ই নিজেরা নিজেরা গেমস উদ্ভাবন করতাম। তৈরি করতাম গল্পের লাইন ও প্লট। এতে আমরা নিজেরাই অভিনয় করতাম বা ব্যবহার করতাম পুতুল, খেলনা। আমার নিজের বাচ্চারাও একই কাজ করে। মাঝেমাঝে এতেই এত মগ্ন হয়ে যায় যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলে এসব।

এই হলো সন্তানকে স্ক্রিন থেকে দূরে রাখার কিছু আইডিয়া।

ইনশাআল্লাহ একসময় আপনার সন্তান টিভিকে মোটেও মিস করবে না। কারণ, তার হাতে আছে এর চেয়েও আরও অনেক আকর্ষণীয় কাজ।

পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট, হ্যান্ডসাম ক্যারিয়ার, অতঃপর একটি সুন্দর সংসার—আমাদের অধিকাংশের জীবনের লক্ষ্য থাকে এরকমই। সুন্দর সংসার খুবই গুরুত্বপূর্ন একটি ফ্যাক্টর। কেননা, একটি সুন্দর সংসার আমাদের দ্বীন পালন অনেকটাই সহজ করে দেয়।

তাই, সংসার নিয়ে ভাবনার ডালপালায় ঘুরে বেড়ানো আমাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় বা অহেতুক কিছু নয়। বরং এটি আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তা ছাড়া বিয়ে তো আমাদের অর্ধেক দ্বীন। তাই, এ বিষয়ে জ্ঞান-তৃষ্ণা থাকা জরুরিই বটে।

'সংসার ভাবনা' বইয়ের আবির্ভাব সেই প্রয়োজন থেকেই। জীবনসঙ্গী কেমন হওয়া উচিত, নারীবাদের বিষাক্ত ক্যান্সার থেকে তাকে মুক্ত রাখার উপায়, পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি বিষয়ের উপর বাস্তবধর্মী আলোচনা ওঠে এসেছে এই বইতে। ইন শা আল্লাহ, আমাদের পারিবারিক জীবন আরও মধুময় করে তুলতে বইটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।